মাঘ ১৩৮৫

আনন্দমেলা

কলকাতা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ

পঙ্কজ রায়ের লেখা

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

সাদর আমন্ত্রণ

জাম্বো সার্কাস

আপনাকে ও পরিবারের সকলকে খুশী করতে জাম্বো তৈরী

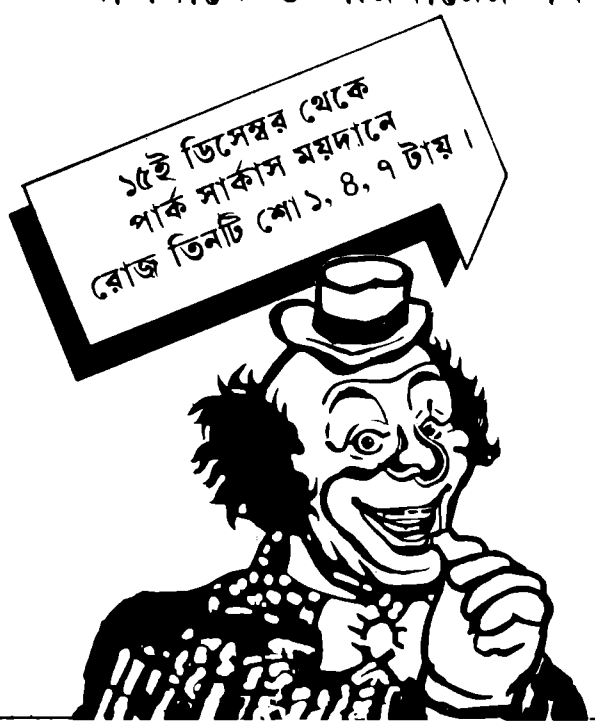

সহরে নতুন সার্কাস।
জাম্বো সার্কাস।
চোখ জুড়নো, মন ভোলানো
নতুন নতুন খেলা নিয়ে
এসেছে। কালো বাঘের খেলা,
ফুটবলার কুকুর, গণিতজ্ঞ হাতী,
শূন্যে দুর্ধর্ষ বাইক চালানো,
আরো ও কত কী। এ ছাড়া তো
সার্কাসের অন্যান্য খেলা আছেই।
আসুন, দেখুন, প্রতিটি মুহূর্ত
উপভোগ করুন।

টিকিটের হার ৭, ৫, ৪, ৩, ২
৭ টাঃ ও ৫ টাঃ টিকিটের
অগ্রিম বুকিং করতে পারবেন
রোজ সকাল ৯ থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

STANDARD

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার
কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র

আনন্দমেলা

মাঘ ১৩৮৫, জানুয়ারি ১৯৭৯, চতুর্থ বর্ষ, দশম সংখ্যা
দেড় টাকা

বিশেষ রচনা
কলকাতা ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ । পংকজ রায় ৫

গল্প
লেজ । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৯
অক্ষরে অক্ষরে । অনিরুদ্ধ কর ৩২
বুলাই । গিরিধারী কুণ্ডু ৪৩

ছড়া
সানি । নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৮
কী বাকি । বিজয় পাল ১১
এক মিনিটের গল্প । সুনন্দা দাশগুপ্ত ৪৮

উপন্যাস
ভূতুড়ে কুকুর । আশাপূর্ণা দেবী ১৭
বনবিবির বনে । বুদ্ধদেব গুহ ৩৭

আত্মকথা
খেলতে খেলতে । চুনী গোস্বামী ১৩

ভ্রমণ-কাহিনী
নারিকেলের দ্বীপমালা । অভী দাশ ২৩
হাতি-শিকারে । অনুরাধা ঘোষ ৫২

কমিক্‌স
গোয়েন্দা বাজ ২১ । টারজান ২৬ । টিনটিন ৩০
বিশ্বকাপ-ফুটবল ৩৬ । নোলেদা ৫৩

লেখাপড়া
মজার পড়া । কুতুক ২৫
সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ৪১

খেলাধুলো
জ্বরের পর জ্বর । অশোক দাশগুপ্ত ৪৯
কলকাতার গ্রাঁ প্রি । পুষ্পেন সরকার ৫১

ধাঁধা-মজা-রহস্য
শব্দ-সন্ধান ২৮ । ধাঁধা ২৮ । কিসের ফোটো ২৯
উত্তর বটে ২৯ । মজার খেলা ২৯ । আটখানা ২৯

অন্যান্য লেখা
তোমাদের পাতা ২২ । দুঃসাহসিক অভিযান ৪২ । মণিমেলার খবর ৪২
আঁকো ৫৪ । শেখো ৫৪

ক্যাপ্টেন কালীচরণের রঙিন ছবি ৪
ক্যাপ্টেন গাভাসকরের রঙিন ছবি ৫৬

প্রচ্ছদ বিমল দাশ

সম্পাদক ঃ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি· আই·টি· রোড কলকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
বিমান মাশুল ঃ ত্রিপুরা ১৫ পয়সা, পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

ক্যাপ্টেন কালীচরণ ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

কলকাতা ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

পঙ্কজ রায়

তিন বছর পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আবার কলকাতার শীতের অতিথি। এই লেখা যখন বেরুবে তখন হয়তো কলকাতায় তৃতীয় টেস্ট মাঝপথে। বাহাত্তর হাজার লোক বসে থাকবে ইডেনে—ব্যাটবলের লড়াই উপভোগ করার জন্যে। যারা মাঠে থাকবে না, থাকবে টিভির কি অন্তত রেডিওর সামনে। আমি নিজেই তো থাকব! ঠিক সেই সময় এ-লেখা পড়ার মেজাজ আসবে না—অনেকেরই।

জানি। তাহলে লিখছি কেন?

লিখছি এই জন্যেই যে, ভারতের মানুষের কাছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের আদর একটু যেন বেশি। আর বিশেষত আমরা,

ওরেল ও উইকস

ভাবপ্রবণ বাঙালিরা, ওদের যতটা আপনজন বলে মনে করতে পারি আর কাউকে তা পারি না। ওদেশের অনেকেরই পূর্ব-পুরুষের ভিটে ভারতবর্ষে। বহু বছর আগে ওখানকার বিরাট বিরাট আখ-বাগানে কাজ করার জন্যে এদেশ থেকে প্রচুর লোক যেত। প্রধানত বিহার আর উত্তরপ্রদেশ থেকে। এইসব লোক আর দেশে ফিরে আসেনি। ওখানেই বসবাস শুরু করে দেয়। কয়েক পুরুষ বাদে ভাষায়, আচার-আচরণে ও পোশাক-পরিচ্ছদে তারা অনেকখানি বদলে গেলেও ধর্ম ও সংস্কৃতির বন্ধনটা একেবারে ছিন্ন হয়ে যায়নি। শুধু তাই নয়। কোন্ সুদূর অতীতের পূর্বপুরুষের স্মৃতি বহন করছে ভারতে যে গ্রাম বা শহর, তার সঙ্গে তারা যোগাযোগ রেখে চলে। বা অন্তত নামটা বলে দিতে পারবে। বিশেষ করে ত্রিনিদাদ ও গায়ানায় এ-রকম লোকের সংখ্যা প্রচুর। তাদের নামের মধ্যেও ঐ পরিচয়, ভারতীয় গন্ধ পাওয়া যায়। কালীচরণ, শিউনারায়ণ, জুমাদীন, রোহন বাবুলাল কানহাই, চরণ সিং, এসব খেলোয়াড়ের নামের দৃষ্টান্ত তো হাতে-হাতেই দেওয়া যায়। তাছাড়া ওদেশে খেলতে গিয়ে ভারতীয় বংশোদ্ভবদের কাছে আমরা যে আদরযত্ন পেয়েছিলাম—ভারত থেকে যে-কোনও দল গেলেই পায়—তাতে আমরা সত্যিই অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের সুভাষ গুপ্তে তো ওদেশের মায়া ছাড়তেই পারল না।

আর-একটা কারণও আছে। স্মৃতিচারণ করতে কার না ভাল লাগে? জন গডার্ডের নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালে কলকাতায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের যে দলটি আসে, তাকে কেন্দ্র করে এই শহরে রীতিমত সাড়া পড়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তাদের এটাই ছিল প্রথম বিদেশ সফর। ভারতে আসার ঠিক আগে দেশে ইংল্যাণ্ডকে নাস্তানাবুদ করে ২—০ ম্যাচে হারিয়ে রাবার দখল করেছে। স্বাভাবিক ভাবেই তাদের খেলা দেখার জন্যে কলকাতা উন্মুখ হয়ে ছিল। তবে এখনকার মতো হুজুগে দাঁড়ায়নি। যতদূর মনে আছে টিকিটের দাম ছিল ১০, ২০, ২৫ ও ৫০ টাকা; খেলার দু'একদিন আগেও অনায়াসে ন্যায্য দামেই পাওয়া গেছে। এসব কথা এখন ভাবা যায়? তাও আবার দুটো খেলার জন্যে সীজন টিকিট—টেস্টের আগে আর একটা খেলা ছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম পশ্চিমবঙ্গ গভর্নরের একাদশ।

গভর্নর'স ইলেভেনের কথায় মনে পড়ে গেল একটা দারুণ মজার ঘটনা। তখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ছিলেন ডঃ কৈলাস-নাথ কাটজু। ওঁর ছেলে বি এন কাটজু (পুরো নামটা বোধহয় বিশ্বনাথ হবে) ক্রিকেট খেলত। ব্যাট করত মোটামুটি। ও ছিল এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির প্লেয়ার। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে কম্বাইণ্ড ইউনিভার্সিটি দলে স্থান পাওয়ার জন্যে ট্রায়াল খেলতে গিয়েছিলাম বোম্বাইতে। সেখানেই ওর সঙ্গে আলাপ। তাছাড়া পরে রোহিনটন বারিয়া ট্রফিতে খেলতেও ওরা কলকাতা এসেছিল। কলকাতায় ফেরার সময় ট্রেনে ওকে হাসতে হাসতে বললাম, "কাটজু, ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নর'স ইলেভেন মানে তো তোমার বাবার ইলেভেন! তোমার বাবাকে বলো না, বললেই চান্স পেয়ে যাবে।"

বিশ্বনাথ কিন্তু হাসল না। একটু গম্ভীর হয়ে গেল। তখন কি আর জানি যে, ও সত্যি-সত্যিই ডঃ কাটজুকে বলবে এবং স্বয়ং ডঃ কাটজুও ওকে টীমে নেবার জন্যে সি এ বি-র কর্তাব্যক্তিদের অনুরোধ করবেন। যখন টীম ঘোষণা করা হল, তখন ওর নাম দেখে আমাদের চক্ষু চড়কগাছ। গভর্নরের অনুরোধ ফেলতে পারে কেউ?

ঐ খেলায় গভর্নরের দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন কার্তিকদা (বসু)। বাংলা থেকে দলে আর ছিলেন নির্মলদা (চ্যাটার্জি), পুটুদা (চৌধুরী), পি বি দত্ত। আমিও ছিলাম। অন্য রাজ্য থেকে কাটজু ছাড়া কলকাতার প্রিয় মুস্তাক আলি, বি বি এবং আর বি নিম্বলকার, সুটেদা (ব্যানার্জি) ও গিরিধারী। মাত্র কিছুদিন আগে রঞ্জি ট্রফিতে ৪৪৩ রান করে বি বি নিম্বলকার ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানে ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড (৪৫২) প্রায় ভেঙে দিয়েছিলেন। (রেকর্ডটা পরে হানিফ ভেঙে দেয়।) কাজে-

কাজেই গোমেজ, জোন্স, ট্রিম ও ফার্গুসনের বিরুদ্ধে তিনি কেমন খেলেন, তা দেখার জন্যে কলকাতাবাসীর কৌতূহল কম ছিল না।

আমি একটা সেঞ্চুরি করেছিলাম এই খেলায়। সে-কথায় আসার আগে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। নিজের কথা লেখার জন্যে কলম ধরিনি। আমার কথা যেখানে যেটুকু উঠছে তা নেহাতই প্রসঙ্গত। কেউ যেন ভুল না বোঝেন আমাকে।

আমার ১০১ নট আউটই গভর্নর'স ইলেভেনে সবচেয়ে বেশি রান ছিল। সেঞ্চুরি ওর আগেও করেছি, কিন্তু সেদিন আমার খুবই আনন্দ হয়েছিল। কারণ একটা সত্যিকারের শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে আমি মনের মতো করে খেলতে পেরেছিলাম ঐ বয়েসে। তখন আমার বয়েস আর কত? মাত্র কুড়ি। কোনও বিদেশী দলের বিরুদ্ধে ওটাই ছিল আমার প্রথম সেঞ্চুরি। পটুদার মিডিয়াম পেসের অফব্রেক আর গিরিধারীর স্লো অফ স্পিন বলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংস ২৫৫ রানে শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গভর্নরের একাদশের সূচনা আরও খারাপ হল। সাতাত্তর রানের মধ্যেই পাঁচ-পাঁচটা উইকেট পড়ে গেল। আমি তখন মিডল-অর্ডার ব্যাটসম্যান ছিলাম। পাঁচ ঘণ্টার কিছু বেশি ব্যাট করেছিলাম। গিরিধারী আর আমার পার্টনার-শিপে ১৭৩ রান যোগ হয়েছিল। বেচারা গিরিধারী ৮৮ রানে আউট হয়ে গেল। কাট, পুল আর ড্রাইভে আমরা দুজনে ইডেন জমিয়ে দিয়েছিলাম। গিরিধারীর লেট-কাটগুলো ছিল সত্যিই দেখবার মতো। আমিও বেশ কয়েকটা অফড্রাইভ করেছিলাম। আমরা ইনিংস টেনে নিয়ে গেলাম ৩১৫তে। ওরা দ্বিতীয় ইনিংসে নিয়মরক্ষার জন্যে ব্যাট করতে নেমেছিল। খেলা ড্র হয়ে গেল। তারিখটা আজও আমার মনে আছে—২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮।

তারিখটা মনে থাকার কথা নয়। কিন্তু আগের দিনই জোহানেসবার্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের হাটন আর ওয়াশব্রুক প্রথম উইকেট জুটিতে ৩৫৯ রান করে টেস্ট-রেকর্ড করেছিলেন। তখন আমরা এ-নিয়ে অনেক আলোচনা করেছিলাম। তাই ঘটনাপরম্পরায় তারিখটা মনে আছে।

তখন কেউ জানত না যে, মাত্র কয়েকদিন বাদেই তৃতীয় টেস্টে আমাদের ইডেনেও একটা রেকর্ড হবে। অবশ্য অন্য রকম। সেটা বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান এভারটন উইকসের। ইডেনে দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরি (১৬২, ১০১) করায় উইকস পর-পর পাঁচ ইনিংসে সেঞ্চুরি করলেন। এখনও পর্যন্ত আর-কেউ এই কৃতিত্বের অধিকারী হতে পারেননি। প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্টে যথাক্রমে দিল্লি (১২৮) ও বোম্বাইতে (১৯৪) সেঞ্চুরি করার আগে উইকস কিংসটনে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি (১৪১) করে এসেছিলেন।

আগের খেলায় সেঞ্চুরির কল্যাণেই হোক বা অন্য কোনও কারণেই হোক, আমি টেস্ট দেখছিলাম প্যাভিলিয়নে উইকসের পাশে বসে। দেখলাম, উইকস যে ব্যাটটা নিয়ে খেলতে নামবে, তার কানাটা একটু ভাঙা-মতন। অবাক হয়ে বললাম, "এই ভাঙা ব্যাটটা নিয়ে তুমি খেলবে?" উইকস একটু হেসে ব্যাটটাতে একবার যেন সস্নেহে হাত বুলিয়ে নিল। বলল, "রায়, এই ভাঙা ব্যাটই আমার 'লাকি' ব্যাট। তিনটে সেঞ্চুরি করেছি এটা দিয়ে।" সত্যিই পয়মন্ত ব্যাট বটে! ঐ ভাঙা ব্যাট নিয়ে সে কী খেলাই না খেলল! আজও সে-খেলা চোখের সামনে ভাসছে। সে কতরকমের মার! (উইকসের একটা বিশেষত্ব ছিল কাট আর ড্রাইভ-এর মাঝামাঝি একটা মার। বলতে পারা যায় হাফ-কাট হাফ-ড্রাইভ।) আর সে-সব মারের পেছনে কী জোর! ভাবলেই মনে হয় এখনও বল দৌড়চ্ছে। তার প্রথম ইনিংসের সেঞ্চুরি যেন ব্যাট-বল দিয়ে রচনা করা এক মহাকাব্য।

পঙ্কজ রায়

ইডেনে পরে বহু খেলা দেখেছি, কিন্তু ও ধরনের খেলা আর দেখিনি। ওর কথা কোনও দিনই ভুলব না।

না। একটু ভুল হল। ইডেনকে আর-একটি উজ্জ্বল ইনিংস (২৫৬) উপহার দিয়ে গেছেন রোহন কানহাই। দ্বিতীয়বার আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আসে, তখন। এটা দেখেছি খুবই কাছ থেকে—ভারতের ফীল্ডার হয়ে। অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন, দুজনের মধ্যে কার ইনিংস বেশি ভাল লাগে আমার। এটা বলা মুশকিল। ঐ খেলাতেই সোবার্স আর বুচারও সেঞ্চুরি করেছিলেন। কিন্তু কানহাই সকলকে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন,—রানের সংখ্যায় নয়, গুণেও। সেদিনকার কোনও দর্শক ঐ ডাবল সেঞ্চুরির কথা ভুলতে পারবেন না। কানহাই নিজে তো নয়ই। কারণ ওটাই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি। তবে একদিক থেকে এই টেস্টটা গোটা ভারতীয় দলের পক্ষে চূড়ান্ত লজ্জার বিষয়। এবং আমরা সকলেই ঐ কলঙ্কের কথা জোর করে ভুলতে চাই। সে-প্রসঙ্গ যথাস্থানে।

বলছিলাম ১৯৪৮-৪৯ সিরিজের তৃতীয় টেস্টের কথা। ইডেনে মুস্তাক আলির সেঞ্চুরির কথাও মনে পড়ছে। পড়তে বাধ্য। সে এক অনবদ্য ইনিংস। মুস্তাকের পক্ষে এটা ছিল একরকম স্ট্রাগল ফর সারভাইভাল। প্রথম দুটো টেস্টে চান্স পাননি। তাঁর আগেরবার কলকাতার দর্শকদের 'নো মুস্তাক নো টেস্ট' দাবি মেনে নিতে হয়েছিল ক্রিকেট বোর্ডকে। হয়তো সেই-জন্যেই তৃতীয় টেস্টে মুস্তাককে দলভুক্ত করা হয়েছিল। এই টেস্টে খারাপ করলেই দল থেকে বাদ হয়ে যাবেন নির্ঘাত। প্রথম ইনিংসে তো খারাপ করেননি—পঞ্চাশের বেশি করেছিলেন। কিন্তু দলে থাকার পক্ষে সেটাও যথেষ্ট নয় বলে দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বেপরোয়া ভঙ্গিতে খেলে ১০৬ করে ইডেনকে তাতিয়ে ও মাতিয়ে দিয়েছিলেন। এবং, বলা বাহুল্য, বীরের সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন। পরে মুস্তাক তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন, অনেক জায়গায় অনেক সম্বর্ধনা পেয়েছি, কিন্তু কলকাতার সেই সম্বর্ধনার সঙ্গে কারও তুলনা হয় না।"

সেবার বাংলা থেকে তিনজন ঐ টেস্টে খেলছিলেন—খোকনদা

(প্রবীর সেন), মন্টুদা (সুধাংশু ব্যানার্জি) আর ভিনু মানকড়। ভিনু তখন মোহনবাগানে খেলতেন। খোকনদা আগেই টেস্ট খেলেছিলেন। মন্টুদা আসায় এই প্রথম একটি ভারতীয় টেস্ট দলে দুজন বাঙালি একসঙ্গে খেললেন। মন্টুদা এই টেস্টে ভাল খেলেও পরে যে কেন আর চান্স পাননি বুঝি না। প্রথম দিনের প্রথম ওভারেই ওপনার অ্যাটকিনসনকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন শূন্য রানে। তার কিছুক্ষণ বাদেই অপর ওপনার অ্যালান রে-কে। পাঁচটা উইকেট পেয়েছিলেন মন্টুদা ঐ ম্যাচে।

অ্যাটকিনসনের কথায় সেই ক্যাচটার কথাও মনে পড়ছে। দ্বিতীয় ইনিংসে গোমেজের বলে ভারতের অন্যতম ওপনার কে সি ইব্রাহিম সিলি-মিড-অনে একটা ক্যাচ তোলেন। সেখানে ছিলেন ক্যামেরন, কিন্তু ক্যাচটা ধরার জন্যে তিনি নিচু হয়ে হাঁটু গেড়ে বসলেও পারেননি, হাঁটুতে লেগে বলটা আরও উঁচু হয়ে উঠে যায় সিলি-মিড-অফে। সেখানে অ্যাটকিনসন সেটা সহজেই লুফে নেন।

কলকাতার ঐ অমীমাংসিত তৃতীয় টেস্টে শেষ দিনে ৩৬৫ রান করলে ভারত জয়ী হত। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। দিনের শেষে ভারত ৩২৫ রান করে তিন উইকেটে। তবে ভারতকে ফেলার জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাদের সবরকম অস্ত্র প্রয়োগ করেছিল। তার প্রমাণ দ্বিতীয় ইনিংসে একমাত্র রে বাদে বাকি সবাই বল করেছিলেন। এমন কী ওয়ালকট পর্যন্ত ক্রিশ্চিয়ানিকে উইকেটকীপিং করতে পাঠিয়ে বল করতে এসেছিলেন। একটা টেস্ট ম্যাচে একই ইনিংসে দশ জন বল করার নজির আর আছে কিনা জানি না। যদি না থাকে, তো ইডেনে ঐ ম্যাচে এটাও একটা রেকর্ড হয়েছে।

রেকর্ড আর রেকর্ড! ১৯৫৮-৫৯-এ তৃতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে কলকাতায় আমাদের যে হার—ইনিংস ও ৩৩৬ রানে, সেটাও একটা রেকর্ড বই কী। অত বড় ব্যবধানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ শুধু ভারতের বিরুদ্ধে কেন, অন্য কারও বিরুদ্ধেই জেতেনি। এইজন্যেই বলছিলাম, ঐ টেস্টটা আমরা ভুলতে চাই। আসলে তখন হল আর গিলক্রিস্ট তাঁদের পেস বোলিং-প্রতিভার মধ্য-গগনে। তার উপর ইডেনের উইকেটে বল সুইং করে বলে ওঁদের খেলা আরও শক্ত হয়ে গিয়েছিল। আমরা কেউই দাঁড়াতে পারিনি—শুধু উমরিগড় ও মঞ্জরেকার বাদে। তবে একটা কথা বলব। এই টেস্টে দ্বিতীয় ইনিংসে আমার বিরুদ্ধে যে কট-আউট দেওয়া হয়েছিল সেটা আম্পায়ার, নাগরওয়ালা সম্পূর্ণ ভুল করেছিলেন। বলটা আমার ব্যাটে লাগেনি, প্যাডে লেগেছিল। কিন্তু আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত, প্রতিবাদ আর করি কী করে?

চিরকাল সকলের দিন সমান যায় না। তাই ওয়েস্ট ইন্ডিজকেও ভারতের বিরুদ্ধে হারতে হল। ওদের দেশে ওদের হারিয়ে এসেছে ভারত ওয়াড়েকারের নেতৃত্বে। কিন্তু স্বদেশে হারানোর জন্যে ভারতকে আর-একটু অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আর সেই জয়গৌরবের স্থানও আমাদের চিরপরিচিত ইডেনেই। ১৯৭৫-এর প্রথম দিনে। ওরা নিশ্চয়ই সেরকম আনন্দ করতে পারেনি সেদিন। এই জয়ের সঙ্গে আমি জড়িত ছিলাম, যদিও পরোক্ষভাবে। তখন আমি সিলেকশান কমিটীতে ছিলাম। কমিটীর চেয়ারম্যান ছিলেন গোপীনাথ। বাঙ্গালোরে ও দিল্লিতে পর পর দুটি টেস্টে হারার পর আমি গোপীনাথকে পরামর্শ দিই স্পোর্টিং উইকেট করবার জন্যে, যাতে আমাদের স্পিনাররা সাহায্য পায়। গোপীনাথ প্রথমটা দ্বিধা করছিলেন। অনেক বুঝিয়ে ওঁকে রাজি করাই। বললাম, আমরা নিজে যদি দাঁড়িয়ে থেকে স্পোর্টিং উইকেট তৈরি করাই, তাহলে নিশ্চয়ই মনের মতো উইকেট পাবে বেদি, চন্দ্রশেখর আর প্রসন্ন। তা-ই হল। আমি নিজে গিয়ে বংশীর সঙ্গে কথা বলে তদারক করে উইকেট এমন ভাবে তৈরি করেছিলাম যাতে স্পিনারদের বেশ-কিছুটা সুবিধে হয়ে যায়। তখন গোপীনাথ উৎসাহিত হয়ে মাদ্রাজেও একই রকম উইকেট করান। এবং ভারত আবার জেতে। বোম্বেতে যদি উমরিগড় বল না সাধতেন তা হলে আমরা রাবার রাখতে পারতাম। নতুন ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে প্রথম খেলা। উমরিগড়কে বোঝাবার চেষ্টা করলাম অনেক। বললাম, "ব্যাটস-ম্যানস উইকেট করে লাভ কী? ওদের ফাস্ট বোলার আছে, ওরা সুবিধা পাবে, মুশকিল হবে আমাদেরই।" স্বয়ং ওয়াংখেড়েও অনুরোধ করেছিলেন আমাদের কথামতো। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। ম্যাচটা আমাদের হাত থেকে ফস্কে গেল। রাবারও।

১৯৭৫-এর প্রথম দিনটি আমাদের কাছে শুভ হয়েছিল। ঠিক এর উল্টো ব্যাপার হয়েছিল ১৯৬৭-তে। সেই আগুন-লাগার কথা বলছি। সে এক দুঃস্বপ্ন। কার কতটা দোষ ছিল ঐ ঘটনার জন্যে, সে-সব বিতর্কের মধ্যে আমি যেতে চাইছি না। বা সেদিনের ইডেনের বর্ণনা দেবার চেষ্টাও করছি না। টুকরো দু-একটা ঘটনার কথা বলছি। সেদিন ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড়রা ভয়ে দিশাহারা হয়ে যেভাবে ছোটাছুটি করছিলেন তা এখনও মনে আছে। ওঁরা ফিরে যাবেন গ্রেট ইস্টার্নে; কেউ ছুটছিলেন গঙ্গার দিকে, কেউ কিংসওয়ে ধরে ময়দানের দিকে এইরকম। ঐ খেলা তো বটেই, গোটা সফরটাই বানচাল হয়ে যেত এই ঘটনার পর। ভাগ্যক্রমে সার ফ্র্যাঙ্ক ওরেল সে-সময় কলকাতায়

মুস্তাক আলি ওয়ালকট

এসেছিলেন নিজের কী একটা কাজে। সার ফ্র্যাঙ্ককে দু' দেশের ক্যাপ্টেন অনুরোধ করেন খেলা চালানোর ব্যাপারে সাহায্য করতে। খেলা চলত না। বহু লোকের ছোটাছুটিতে উইকেটও নষ্ট হয়েছিল কিছুটা। সার ফ্র্যাঙ্ক বুঝেছিলেন খেলা বন্ধ হয়ে গেলে কলকাতার লোক কতটা ক্ষুব্ধ হবে এবং তার পরিণামও ভাল হবে না। তাই যথার্থ ক্রিকেটারের মতোই তিনি খেলাটাকে বাঁচিয়ে দিলেন। এবং সফরের বাকি অংশটাকেও। একটা পুরো দিন খেলা না হওয়া সত্ত্বেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইনিংসে জেতে। ঠিক এইরকম অশান্তি হয়েছিল ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের ঐ টেস্টটিতে, যার কথা আগে বলেছি।

১৯৬৭-এর ১লা জানুয়ারির আর একটা ঘটনার কথা বলেই শেষ করছি। খেলোয়াড়রা যখন প্রাণের ভয়ে ইতস্তত ছুটোছুটি করছে তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভাইস ক্যাপ্টেন কনরাড হান্ট এন সি সি প্যাভিলিয়ন থেকে বেরিয়ে এসে জীবনকে তুচ্ছ করে দেশের পতাকাকে আগুনের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়েছিলেন। দেশপ্রেমের অনেক কথা ও কাহিনী শুনেছি, পড়েছি, ছায়াছবিতে দেখেছি। কিন্তু দেশপ্রেমের এত বড় প্রমাণ নিজের চোখে আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না। নিঃসন্দেহে হান্টের জীবনের যে-কোনও ইনিংসের চেয়েই এটা বেশি দামি।

সানি

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আছেন ইনি, আছেন উনি,
আছেন তিনি, আর
সক্কলকে ছাড়িয়ে আছেন
সুনীল গাভাসকার।
তার মানে কি এই যে সুনীল
দারুণ লম্বা মাথায় ?
না রে, দাদা, সুনীল লম্বা
রেকর্ড-বইয়ের পাতায়।
ইনি উনি তিনি যখন
আসেন এবং যান,
একা সুনীল তখন ডবল-
সেঞ্চুরি হাঁকান।

ছাড়ার বলটা ছাড়েন সুনীল,
মারার বলটা মারেন;
কাট-ড্রাইভ-পুল-হুকের অস্ত্র
ইচ্ছেমতন ঝাড়েন।
বোলার গলদ্‌ঘর্ম, মাত্র
একটি চিন্তা তাঁর :
পরের বলে সুনীল নেবেন
চার নাকি সিক্সার !
আমরা জানি, ছোট্ট সানি
এবার দিয়ে তুড়ি
ডবল ছেড়ে একটি ট্রিপ্‌ল
হাঁকাবে সেঞ্চুরি।

ছবি বিমল দাশ

লেজ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

বাসা বদলানোর পর বদ্যিনাথ কিছু ফাঁপরে পড়ে গেল। যে বাড়িতে এল সে-বাড়ি না হোক তো এক দেড়শ' বছরের পুরনো। নতুন চুনকাম করা সত্ত্বেও নোনাধরা দেয়ালের চুনবালি খসে পড়ছে, গত বর্ষার জলের ছাপ এখনো দেয়াল থেকে মোছেনি। তার ওপর বড্ড ঘুপচি আর অন্ধকার, আলো-বাতাসের বালাই নেই। চারদিকে সব সময়ে একটা ভেজা-ভেজা ভাব। দেয়াল আর মেঝেয় হরেক রকমের ফাটল। তাতে কাঁকড়াবিছে তেঁতুল-বিছের আস্তানা, এখানে-সেখানে উইয়ের সুড়ঙ্গ পথ, আরশোলা ফরফর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা দিন, লুকনো গর্ত থেকে মাঝে মাঝে একটা ব্যাঙ ডাকে। বদ্যিনাথের নব্বই বছরের বুড়ি-মা দিন-রাত ঘ্যান-ঘ্যান করছেন, "এ কী সোঁদরবন বাবা? কোন্ জীব-জন্তুটা নেই এখানে? ঠাকুরঘরে বাদুড় পর্যন্ত ঝুলে আছে।"

"শুধু বাদুড়?" বদ্যিনাথের গিন্নি ঘোমটা খসিয়ে বলেন, "ভাঁড়ার ঘরের জল-নিকাশি ফুটো দিয়ে একটা লেজ বেরিয়ে যেতে দেখলুম। তা সে কিসের লেজ কে জানে!"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বদ্যিনাথের মা বলেন, "লেজের কথা আর বোলো না। লেজ আমি দিনরাত দেখছি। পরশু রাতে ঘুম ভেঙে মশারির গায়ে একটা কাঁটাওলা লেজ, গতকাল আহ্নিকে বসে ঠাকুরের সিংহাসনের নীচে একটা লোমওলা লেজ, আজ সকালে বাইরের ঘরের চৌকির তলায় একটা লিকলিকে লেজ, আমার নিজের চোখে দেখা। তবে জন্তুগুলোকে ঠাহর করতে পারিনি।"

বদ্যিনাথের ছেলে মল্লিনাথ ছেলেবেলা থেকেই ভারী রোগা-ভোগা। ফ্যাকাশে সরু চেহারা। তার হাতে-গলায় রাজ্যের মাদুলি আর শেকড়-বাকড় বাঁধা। সে খেলে না, ছোটে না, দুষ্টুমি করে না। কাঁচকলা আর পেঁপের ঝোল দিয়ে ভাত খায় আর চুপ করে শুয়ে বসে থাকে। রোগে ভোগে বলে তার ঠাকুমা সবাইকে সাফ বলে দিয়েছেন, "বংশের ঐ একটি মাত্র সলতে। লেখাপড়ার ধকল যদি রোগা শরীরে না সয়? নাতি আমার বেঁচে থাক, লেখাপড়ার দরকার নেই।"

তাই মল্লিনাথ ইস্কুলে-পাঠশালেও যায় না। ঘরে বসে খুশি-মতো একটু-আধটু পড়ে। কথাবার্তা বড় একটা বলে না কারো সঙ্গে। মা বা ঠাকুমার আঁচলের আড়ালে সে বড় হয়। মা-ঠাকুমার কথা শুনে মল্লিনাথও চিঁচিঁ করে বলল, "লেজ? লেজ তো আমিও

সুরেশ জোর কদমে চলছে

সুরেশ রোজ নিউট্রামূল খেতে দারুণ ভালোবাসে। নিউট্রামূল হ'ল আমূলের তৈরী সুস্বাদু শক্তিবর্ধক পানীয়। আমূল মিল্কের ঘন ক্রীমের পুষ্টিতে ভরপুর নিউট্রামূলে আছে—আসল কোকো, মল্ট আর চিনি।

আর আশ্চর্য্য! এত গুণ সত্বেও নিউট্রামূলের দাম কম। নিউট্রামূলের ৫০০ গ্রাম টিন মাত্র ১২ টাকা ২১ পয়সা, স্থানীয় কর, সেণ্ট্রাল সেল্‌স ট্যাক্স ও মাশুল আলাদা।

সুরেশ আর এখন জগ্গুও সারাদেশের হাজার হাজার লোকের মতনই রোজ নিউট্রামূল খেতে দারুণ ভালোবাসে।

আমূল-এর
নিউট্রামূল
প্রতি কাপ কর পান, হয়ে ওঠো পালোয়ান।

daCunha/N/3 Ben

দেখি। আমার পড়ার টেবিলের ড্রয়ার থেকে মাঝে মাঝে একটা সবুজ রঙের ভারী সুন্দর লেজ বেরিয়ে ঝুলে থাকে।"

"কী সর্বনাশ!" মা ঠাকুমা একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠেন।

বদ্যিনাথ গরীব মানুষ হলেও রোজ ছেলের জন্য খেলনা আনে, খাবার আনে। কিন্তু ছেলের মুখে হাসি ফোটে না, চোখে মজার দৃষ্টি জ্বলন্ত হয় না। বদ্যিনাথ বল কিনে এনে হাতে দেয়, খেলনা-বন্দুক দেয়, লাট্টু দেয়, ঘুড়ি-লাটাই দেয়, বলে, "কী বাবা, একটু আনন্দ পাচ্ছ? এই দ্যাখো বল, এমনি করে পায়ে নিয়ে ছুটবে। দুম করে লাথি কষাবে, কেমন আনন্দ হবে দেখো।... ঘুড়ি কেমন শোঁ করে আকাশে ওড়ে, না বাবা? দেখেছ তো! তেমনি ওড়াবে ছাদে উঠে, দেখবে বুকখানা ভারী হালকা হবে, ফুর্তি হবে খুব।... বন্দুক দিয়ে রোজ টিপ করবে। কত আরশোলা, ইঁদুর, চামচিকে চারদিকে দেখছ তো! টিপ করে করে মারতে-মারতে দেখো রক্ত গরম হয়ে উঠবে।... এই দ্যাখো লাট্টু, কেমন বনবন ঘোরে জানো?"

কিন্তু খেলনা পড়ে থাকে, খাবারও ছোঁয় না মল্লিনাথ। মাদুলির ভারে কুঁজো হয়ে চুপ করে ফ্যাকাশে মুখে বসে থাকে। তার রক্ত গরম হয় না, আনন্দ হয় না, ফুর্তি হয় না। বদ্যিনাথ তার সামনে বল খেলে দেখায়, ঘুড়ি উড়িয়ে দেখায়, লাট্টু ঘুরিয়ে দেখায়, দেখাতে-দেখাতে হাঁফিয়ে ওঠে, নেতিয়ে পড়ে, চিড়বিড়োতে থাকে।

নতুন বাসায় এসে মল্লিনাথ আরো ফ্যাকাশে হয়েছে, আরো রোগা, আরো ন্যাতানো। মা, ঠাকুমা বার-বার তার দিকে তাকিয়ে সারা দিন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছেন। ছেলে বাঁচলে হয়! তাই সবুজ লেজের কথা শুনে সবাই আঁতকে উঠল। টেবিল ঝাড়পোঁছ করা তো হলই, সারা বাড়িতে ছড়ানো হল কড়া কীটনাশক। এক তান্ত্রিক এসে প্রায় বিশ গ্রাম ওজনের আর-একটা তাবিজ বেঁধে দিয়ে গেল গলায়। মল্লিনাথ আরো একটু কুঁজো হয়ে গেল তার ভারে।

তা বলে সবুজ লেজটা কিন্তু তাকে ছাড়ল না। তাবিজ নেওয়ার পরদিন সকালে পড়ার টেবিলে বসে সে 'গুপ্তধনের খোঁজে' নামে একটা গল্পের বই পড়ছিল। কনুইতে সুড়সুড়ি লাগায় সে তাকিয়ে দেখল সামান্য ফাঁক হয়ে থাকা ড্রয়ার থেকে সেই কচি কলাপাতা রঙের সুন্দর সবুজ সরু লেজটা বেরিয়ে এসে খুব আদুরে-আদুরে ভাব দেখিয়ে নড়াচড়া করছে। মল্লিনাথ যে ভয় পেল তা নয়। সে চিরকাল কলকাতায় মানুষ। এই প্রায় দশ বছর বয়স পর্যন্ত সে একমাত্র চিড়িয়াখানায় ছাড়া আর কোথাও তেমন কোনো জীবজন্তু দেখেনি। লেজটা দেখে তাই তার ভারী অবাক লাগে। ভারী সুন্দর দেখতে, হাত দিতে ইচ্ছে করে। একটু ভয়ে-ভয়ে, সংকোচের সঙ্গে মল্লিনাথ হাত বাড়িয়ে লেজটা একটু ছুঁয়ে দিল। সুট করে সরে গেল লেজটা। পরদিন আবার বেরিয়ে এসে সুড়সুড়ি দিল হাতে। মল্লিনাথ আবার একটু ছুঁল। আর এইভাবেই রোজ সেই সবুজ লেজটার সঙ্গে তার দেখা হতে থাকে। একটু-একটু করে ভাব হতে থাকে। মল্লিনাথের ভারী ভাল লাগে লেজটাকে। একদিন ড্রয়ারটা একটু বেশি ফাঁক করে রাখল সে। লেজটা বেরিয়ে আসতেই উঁকি মেরে দেখল ভিতরে একটা বেশ লম্বা গড়নের সাপের মতো দেখতে প্রাণী কুন্ডলি পাকিয়ে ঝিমোচ্ছে। পরদিন ড্রয়ারটা আরো ফাঁক করল মল্লিনাথ, সকাল-বেলা যথারীতি আবার লেজটার সঙ্গে ভাব করতে-করতে প্রাণীটিকে দেখল আড়চোখে। ছোটখাটো একটা আমুদে সাপই হবে। অলসভাবে শুয়ে-শুয়ে একটা আরশোলা চিবোচ্ছে।

পরদিন মল্লিনাথের ধৈর্য থাকল না। লেজটা বেরোতেই ড্রয়ারটা এক ঝটকায় খুলে ফেলল। লেজটা ধরল মুঠো করে। করুণ স্বরে বলল, "আমার যে আর-কোনো বন্ধু নেই।"

সাপটা মল্লিনাথের এই আচরণে ভারী বিরক্ত হয়ে কিলবিলিয়ে পিছলে বেরিয়ে গেল। সড়াত করে ড্রয়ার থেকে নেমে প্রাণপণে ছুটল ভেতর বাড়ির দিকে। মল্লিনাথও লাফিয়ে ওঠে। তার একমাত্র বন্ধু, ভাবের পাত্র পালিয়ে যাচ্ছে! প্রাণপণে মল্লিনাথও তার পিছনে ছোটে।

সবুজ সাপটা ভারী চালাক। সোজা পথে না গিয়ে সে খানিকক্ষণ এ-ঘর সে-ঘর পালিয়ে বেড়ায়। আলমারির তলা, খাটের তলা, জুতোর র‍্যাকের পিছন, চৌকাঠের আড়ালে ঘুরে অবশেষে উঠোন পেরিয়ে গিয়ে ভাঁড়ার-ঘরের পিছনে একটা ঘুপসি ঘুঁটে-কয়লা রাখার ঘরে গিয়ে ঢুকল। ঘরের কোণে একটা মস্ত গর্তে সেঁধিয়ে গেল সুট করে।

মল্লিনাথ তা বলে হাল ছাড়ল না। গর্তের কাছে গিয়ে প্রথমে অনেক কাকুতি-মিনতি করল। কাজ হল না দেখে একটা লোহার শাবল এনে গর্ত বড় করতে বসল। মল্লিনাথের গায়ে জোর নেই, মাদুলির ভারেই সে জর্জরিত। কিন্তু বন্ধু হারিয়ে যাওয়ার শোকে তার গায়ে দ্বিগুণ বল এল। তাবিজ কবচ মাদুলির জন্য শাবল চালাতে অসুবিধে হচ্ছিল বলে এক-এক টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে দিল সেগুলো। ভারী শাবলটা প্রাণপণে চালাতে লাগল।

হাত দেড়েক গর্ত খোঁড়ার পরই সে একটা ভুসভুসে ইঁটের

কী বাকি

বিজয় পাল

মা আমাকে বলতেন, "খোকা,
চাঁদ জ্বেলে রাতে যাস পথে,
নদীর ওপরে সাঁকো আছে,
নদীর ওপারে কোনমতে
গেলে পাবি পাখির পালক—
আরো কিছু দূর হেঁটে গেলে
দেখবি সে ঠিক জেগে আছে
রাতভর হ্যারিকেন জ্বেলে।"

বাবা চুপে বলতেন, "খোকা,
নদী কি বড়ই একরোখা?
চলে যায় তবু যেন আছে
ঠিক তোর মত এত কাছে!"

মা ও বাবা বলতেন, "খোকা,
তুই তো নেহাত নোস বোকা—
বল দেখি পেলে নদী পাখি
পাবার কী থাকে আর বাকি?"

গাঁথনি পেল। শাবলের দুটো চাড়ে উপড়ে ফেলল ইঁট। দেখল ঘরের নীচে আর-একটা গুপ্ত কুঠুরি রয়েছে। ঘুটঘুটি অন্ধকার। গর্তে মুখ দিয়ে মল্লিনাথ ডাকে, "এসো ভাই সবুজ লেজ, আমার যে তুমি ছাড়া বন্ধু নেই। আমি যে ইস্কুলে যাই না, কারো সঙ্গে ভাব করতে পারি না, সবাই যে আমাকে খ্যাপায়।"

কিন্তু সবুজ লেজ আর বেরোয় না। মল্লিনাথ একটা টর্চ নিয়ে এসে গর্তের মধ্যে লাফিয়ে নেমে পড়ল।

চোর-কুঠুরিতে টর্চের আলো ফেলে সে দেখল, চারদিকে তিন-চারটে লোহা আর কাঠের সিন্দুক। অনেক রুপোর আর সোনার বাসন রয়েছে দেয়াল-আলমারিতে। কিন্তু সেসব গ্রাহ্যও করল না মল্লিনাথ। আঁতি-পাঁতি করে খুঁজতে লাগল তার বন্ধুকে। সিন্দুক শাবলের চাড়ে খুলে ফেলে দেখল, রাশি-রাশি সোনা আর রুপোর মোহর আর টাকা, হিরে জহরত, গয়না, সোনার বাঁট। সব হাঁটকে-মাটকে সে সবুজ লেজকে খুঁজতে থাকে। কিন্তু কোথাও পায় না। পায় না তো পায় না।

ক্লান্ত হয়ে সে একসময় শাবল আর টর্চ ফেলে দিয়ে হাঁটুতে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদল অনেকক্ষণ। তারপর খুব রেগে গিয়ে বলল, "ঠিক আছে, আমিও মজা দেখাচ্ছি। আজ থেকেই আমি অন্য সব ছেলের সঙ্গে মিশব। তাদের সঙ্গে ভাব করব, খেলব। তখন দেখো তোমার হিংসে হয় কি না।"

এই বলে মল্লিনাথ কুঠুরির বাইরে বেরিয়ে আসে। গর্তের মুখ ভাল করে ইঁট আর মাটি দিয়ে বুজিয়ে দেয়। তার চোখে জল, মুখ থমথম করছে অভিমানে।

দুম দুম করে পা ফেলে হেঁটে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে।

পাড়ার ছেলেরা গলির মুখ আটকে ইঁট সাজিয়ে রবারের বলে ক্রিকেট খেলছিল। মল্লিনাথ গিয়ে বল কেড়ে নিল একটা ছেলের হাত থেকে। তারপর দৌড়ে গিয়ে এমন জোরে বল করল যে, ইঁটের স্টাম্প পর্যন্ত তিন হাত ছিটকে গিয়ে ভেঙে পড়ল। ছেলেরা মল্লিনাথের এলেম দেখে খ্যাপাতে ভুলে গেল। 'ওস্তাদ ওস্তাদ' বলে চেঁচাল কয়েকটা ছেলে। মল্লিনাথ পরের বলটা করল আরো ভয়ংকর। বলটাই ফেটে গেল ফটাস করে। যার বল, সে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

মল্লিনাথ কাঁদুনে ছেলেটার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, "কুছ পরোয়া নেই। আমার বল ব্যাট অনেক আছে। আনছি।" বলে দৌড়ে গিয়ে মল্লিনাথ ব্যাট বল আনে। খেলা আবার জমে ওঠে।

মল্লিনাথ ব্যাটও করল অসাধারণ। রাগে গা রি-রি করছে। তাই এত জোরে ব্যাট চালাল যে, মার খেয়ে তিনতলা চারতলা পাঁচতলা বাড়ির ছাদ ডিঙিয়ে বল গিয়ে ওভার বাউন্ডারি হতে লাগল। তার খেলা দেখে সবাই থ।

অনেকক্ষণ খেলে ঘেমে চুমে মল্লিনাথ যখন বাসায় ফিরল, তখন তার রাগ অনেকটা কমেছে, মুখে হাসি ফুটেছে, চোখে মড়ার দৃষ্টি খুব জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। সেই দৃশ্য দেখে তার মা আর ঠাকুমা ভয় খেয়ে কেঁদে খুন। "ওগো, কে আমাদের বাছাকে ওষুধ করেছে?"

শুনে মিটিমিটি হাসল মল্লিনাথ। ছাদে গিয়ে সে অনেকক্ষণ ঘুড়ি ওড়াল, বন্দুক টিপ করে তিনটে কাঁকড়াবিছে ঘায়েল করল, বনবন করে লাট্টু ঘোরাল। বিকেলে পাড়ার কাছে মাঠে গিয়ে ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলে তিন-তিনটে গোলও দিয়ে দিল মল্লিনাথ। সন্ধেবেলা বদ্যিনাথ বাড়ি ফিরলে সে গিয়ে গম্ভীর মুখে বলল, "বাবা, আমাকে ইস্কুলে ভর্তি করে দাও। আমার অনেক বন্ধু চাই।"

শুনে বদ্যিনাথের ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। মল্লি ইস্কুলে যাবে? যেতে-আসতেই হাঁফ ধরে যাবে ছেলের!

ওদিকে মল্লিনাথের কাণ্ড দেখে মা আর ঠাকুমা শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে চেঁচাচ্ছেন আর কাঁদছেন। তাঁদের ধারণা মল্লি পাগল হয়ে গেছে, এবার হয়তো কামড়ে দেবে। বাড়ির চাকর তান্ত্রিককে ডাকতে গেছে।

বদ্যিনাথও মূর্ছা যাচ্ছিল। মল্লিনাথই তাকে জল-টল দিয়ে চাঙ্গা করল। বলল, "সবুজ লেজটা আমার সঙ্গে খুব বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে। ওকে আমি মজা দেখাব।"

বদ্যিনাথ হাঁ করে চেয়ে থাকে। কিছু বুঝতে পারে না।

তখন মল্লিনাথ ঘটনাটা খুলে বলে তার বাবাকে নিয়ে গিয়ে গর্ত দেখায়। মাটি ফের খুঁড়ে দুজনে মিলে চোর-কুঠুরিতেও নামে। সব দেখিয়ে মল্লিনাথ বদ্যিনাথকে বলে, "দেখলে তো. সবুজ বন্ধুর জন্য খামোখা কত খেটেছি।"

বদ্যিনাথ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, "তা বটে।"

মল্লিনাথ একমুঠো হিরে তুলে নিয়ে রাগের চোটে মেঝেয় ছুঁড়ে মেরে বলে, "ওকে মজা দেখাব। অনেক বন্ধু হবে আমার, তখন বুঝবে।"

"ঠিক, ঠিক।" বদ্যিনাথ হাসিমুখে বলে।

তারপর বাপ-ব্যাটায় উঠে এসে গর্ত বুজিয়ে ফেলে। পরদিন রাজমিস্ত্রি এনে জায়গাটায় পাকা গাঁথনি দিয়ে দেয়।

এরপর থেকে মল্লিনাথ ক্রমে ক্রমে ভারী জলজ্যান্ত হয়ে ওঠে। যেমন লেখাপড়ায় তেমনি খেলাধুলোয়।

চোর কুঠুরির কথা বাপ-ব্যাটা আর মুখেও আনে না।

ছবি সুধীর মৈত্র

খেলতে খেলতে

চুনী গোস্বামী

॥ ১৬ ॥

টোকিও এশিয়ান গেমসের ফুটবল কোচিং ক্যাম্প কটকে শুরু হবার দিন কুড়ি আগে জলবসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে বড্ড কাহিল হয়ে পড়েছিলুম। চিন্তা ছিল ক্যাম্পে পরিশ্রমের ধকলটা সহ্য করতে পারব কিনা। কোচ ছিলেন আবার বাঘাদা, যিনি অল্প পরিশ্রমে খুশি হতেন না। বলে পা ছোঁয়াবার আগে মাঠের চার পাশ দিয়ে দশ-বারো পাক দৌড় করাতেন, ব্যায়াম করাতেন।

মাঠে বিরতির সময় ভারতীয় খেলোয়াড়রা (টোকিও)

দুর্বলতা তাড়াতাড়ি কাটিয়ে তুলতে দু' শিশি আলফালফা টনিক সঙ্গে করে কটক গিয়েছিলুম। কটকে কষ্টসাধ্য ট্রেনিং এবং কলকাতায় ট্রায়াল ম্যাচের পর কাদের নিয়ে আটান্নর এশিয়ান গেমসে দল গড়া হয়েছিল দ্যাখো।

গোলকীপার—থঙ্গরাজ (সার্ভিসেস) ও নারায়ণ (বোম্বাই); **ব্যাক**—আজিজ—অধিনায়ক (হায়দরাবাদ), লতিফ (বোম্বাই) এবং সালাম (বাংলা); **হাফব্যাক**—কেম্পিয়া, বীরবাহাদুর, আমেদ হোসেন, নিখিল নন্দী (বাংলা) ও নূর (হায়দরাবাদ); **ফরোয়ার্ড** পি কে ব্যানার্জি, চুনী গোস্বামী, দামোদরন, রহমতউল্লা বলরাম (বাংলা), কানন (হায়দরাবাদ) ও পবিত্রন (বোম্বাই)।

বাঘাদাই দলের কোচ হয়ে টোকিও গিয়েছিলেন। রহিম সাহেবের কোচিং-এ ছাপ্পান্ন সালে মেলবোর্ন অলিম্পিকে ভারত চতুর্থ স্থান দখল করা সত্ত্বেও বাঘাদাকে কোচ করা হয়েছিল বোধহয় ফুটবলে তাঁর অবদানের কথা স্বীকার করে। কত খেলোয়াড়কেই তো গড়েপিঠে তিনি বড় করে তুলেছেন। তাছাড়া বাঘাদা ছিলেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। রহিম সাহেব নিশ্চয়ই খুব বড় ও ভাল কোচ ছিলেন। কিন্তু ঠিক নিরপেক্ষ বলতে যা বোঝায় তা ছিলেন না। একটু চাপ দিয়েই তো রোম অলিম্পিকের সময় তাঁর ছেলে হাকিমকে ভারত-দলে জায়গা করে দিয়েছিলেন। হাকিমের তেমন যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও। অথচ বাঘাদা পঞ্চান্নর কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবলে ভারত দলে কেম্পিয়াকে ঢুকিয়েছিলেন নিজের ছেলে তাপস সোমকে বাদ দিয়ে। তাপসের তখন নাম ছিল কেম্পিয়ার চেয়ে বেশি। ভাল ফর্মেও ছিল। তবু ফুটবলের প্রতি অসাধারণ অনুরাগ, সংগ্রামী-শক্তি ও অনুশীলনে দারুণ আগ্রহের আঁচ পেয়ে তখনকার উঠতি খেলোয়াড় কেম্পিয়াকেই বাঘাদা দলে নিয়েছিলেন, প্রধান কোচ রন মীডের উপর প্রভাব খাটিয়ে। ইংরেজ কোচ রন মীড তখন ছিলেন ভারতের কোচ।

কেম্পিয়ার খেলা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে, সে কী আন্তরিকতা নিয়ে খেলে গেছে এবং সারাক্ষণ সংগ্রাম করার কী অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তার। খুব একটা ট্যালেন্টেড খেলোয়াড় সে ছিল না ঠিকই, কিন্তু ফুটবলের প্রতি তার ছিল অগাধ ভালবাসা, অনুশীলনে কখনও বিন্দুমাত্র ফাঁকি দিত না। একবার ডুরান্ডের ফাইনালে আমাদের জয়ের পরদিন সকালেই দেখি কেম্পিয়া অনুশীলন করতে দিল্লির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে চলে গেছে। ডুরান্ডের খেলার সঙ্গেই আগে ফুটবল মরসুম শেষ হয়ে যেত। কেম্পিয়া স্টেডিয়াম থেকে ফিরে আসার পর আমি বললুম, মরসুম তো শেষ হয়ে গেছে, ডুরান্ড কাপও আমরা জিতে নিয়েছি, আজও অনুশীলনে গেলে কেন? কেম্পিয়া সহজ-ভাবে বলল, "মরসুম শেষ হুয়া, লেকিন হামারা ফুটবল তো শেষ নেহি হুয়া।" এইরকম ছিল কেম্পিয়া। এই আগ্রহ দেখেই ওর উপর বাঘাদার নজর পড়েছিল। একেবারে প্রথম দিন থেকে। পঞ্চান্নর কোয়াড্রাঙ্গুলারের ক্যাম্প খোলা হয়েছিল কলকাতার রেস কোর্সের বিপরীত দিকের একটি মাঠে। প্রথম দিন কোচ বাঘাদা সবার আগে ওখানে পৌঁছে দেখেন তাঁরও আগে ওখানে গিয়ে মাঠে পাক দিয়ে দৌড়চ্ছে একটি অচেনা খাটো চেহারার কালো ছেলে। "হু আর ইউ," প্রশ্ন করতেই জবাব পেলেন, "আই কাম ফ্রম বাঙ্গালোর। মাই নেম ইজ কেম্পিয়া।" তখন থেকেই কেম্পিয়াকে চিনে রেখেছিলেন বাঘাদা। কেম্পিয়া সম্পর্কে আরও গল্প আছে। পরে বলছি।

মেলবোর্ন অলিম্পিকে বদরু ব্যানার্জি অধিনায়ক হওয়ায় আজিজের মনে হয়েছিল, তাঁকে উপেক্ষা করা হয়েছে। এই মনোভাবটা বোধহয় কেটে গিয়েছিল টোকিও এশিয়ান গেমসে ফুটবল দলের অধিনায়ক হয়ে। খেলাধুলো হয়েছিল ২৪ মে থেকে ১ জুন পর্যন্ত। গেমস শুরু হবার কদিন আগেই ভারতের পুরো দলের সঙ্গে একখানি চার্টার্ড প্লেনে আমরা টোকিও পৌঁছলুম। হনেদা এয়ারপোর্টে পৌঁছেই আমাদের চোখ জুড়িয়ে গেল চতুর্দিকের মনোরম দৃশ্য দেখে। আগে দূরপ্রাচ্যের বহু শহরেই গিয়েছি। কিন্তু টোকিও শহরের বৈভব ও শোভার সঙ্গে কোনো শহরের তুলনা চলে না। আকাশে-মাথা-ঠেকানো সব বাড়ি, টিউব রেল, মসৃণ রাজপথ সুন্দর করে

বই পড়া মানে

এন বি টি'র ছোটদের বই শুধু ভাললাগার নয়—আরো আরো ভাললাগার বই।

যেমন গল্প, তেমনি ছবি। আর তেমনি দাম — মাত্র দেড় টাকা! এখন ৪৭টা বই সব ভাষাতেই পাওয়া যাচ্ছে। ক্লাসের বন্ধু যে ভাষাভাষীই হোক —উপহার খোঁজার সমস্যাও আর রইল না, দেখো আর কেনো। নিজের জন্য তো বটেই।

মেতে থাকা আর

খেলা

ভাললাগা

কয়েকটি বাংলা বই

কাশ্মীর
সে অনেক কালের কথা
বাপু
সকলের সাথী সবার বন্ধু
সোনার অভিযান
ফুল ও মৌমাছি
অযোধ্যার রাজকুমার
রেড ক্রশ কাহিনী
হকি খেলায় ভারত
রূপা নামে হাতিটি

প্রতি বই দেড় টাকা

যাদের কাছে এন বি টি'র বই পাওয়া যাচ্ছে :

পাব্লিকেশন ডিভিশন, ৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট; লেখক সমবায় সমিতি, ই-৯২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট; স্টার বুক হাউস, ৬৫-এ মহাত্মা গান্ধী রোড; উষা পাব্লিশিং হাউস, ১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট; সিনহা বুক এজেন্সী, ৭১/২ মহাত্মা গান্ধী রোড; সায়েন্টিফিক বুক এজেন্সী, ২২ রাজা উডমান্ট স্ট্রীট ॥

তাছাড়া আমাদের অফিসে—

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, এ-৫ গ্রীন পার্ক, নয়াদিল্লি ১১০ ০১৬

সাজানো দোকান-পশার—এমন কী দামি মার্সিডেস বেঞ্জ গাড়িতে ট্যাক্সি-মিটার। সব দেখে আমাদের বুঝতে একটুও অসুবিধা হল না যে, যুদ্ধবিধ্বস্ত জাপান কীভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এবং সারা দেশে কী বিপুল কর্মোদ্যোগ। গেমসের আয়োজনেও এই কর্মোদ্যোগের পর্যাপ্ত পরিচয়। তখনই প্রায় দেড় কোটি টাকা খরচ করে তৈরি করা হয়েছিল নতুন স্টেডিয়াম, আরো এক কোটি টাকায় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুইমিং পুল। এ ছাড়া রাইফেল রেঞ্জ, জিমন্যাশিয়াম, ইয়াটিং কোর্স এবং ছোট আকারের বহু স্টেডিয়াম। অবশ্য জাপান সরকারের চোখ ছিল ভবিষ্যতের দিকে। চৌষট্টির অলিম্পিকের কথা মনে রেখেই বিপুল আয়োজন করা হয়েছিল। গেমসে যোগ দিয়েছিলেন এশিয়ার উনিশটি দেশের দেড় হাজার প্রতিযোগী।

অন্যান্য গেমসের সঙ্গে একটু পার্থক্য ছিল। প্রতিযোগীদের থাকার জন্য পৃথক ভিলেজের ব্যবস্থা ছিল না। শহরের সবচেয়ে কর্মচঞ্চল এলাকায় দাইইচি হোটেলের এক একটি তলায় বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। দাইইচি তখন টোকিওর সবচেয়ে বড় হোটেল। এখনকার আরও বড় হোটেল—হোটেল ওটানু বা হিল্টন হোটেল তখন তৈরি হয়নি।

দাইইচি হোটেলে পৌঁছে আমরা পড়লুম এক সমস্যার মুখে। আমাদের যেমন নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান তেমন চেহারার মধ্যেও অমিল। কেউ কালো কেউ ফর্সা। থঙ্গরাজ, নারায়ণ, পাদুম্মন সিংয়ের বিশাল বপু, সবাই বিরাট লম্বা। নিখিল, পবিত্রন, দামোদরন, বীর বাহাদুর, কেম্পিয়া বেশ খাটো চেহারার। কারো আবার গায়ের রং যেমন কালো, তেমন মাথায় কাফ্রিদের মতো কোঁকড়া চুল। বলবীর সিং, মিলখা সিং, বলাকার সিং প্রভৃতির মাথায় পাগড়ি, আবার অনেকের মাথাই খোলা। স্টিফি ডি'সুজা নামেই মেমসাহেব, কিন্তু দেখতে অতিমাত্রায় ভারতীয়, আবার এলিজাবেথ ডেভেনপোর্ট যেন খাঁটি মেম। কারো সুন্দর মুখশ্রী, বাঁশির মতো নাক—কারো মঙ্গোলিয়ান মুখ, থ্যাবড়া নাক।

হোটেল ম্যানেজার কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, আমরা একটি দেশ থেকে এসেছি। একটি দেশের জন্য এক একটি তলা নির্দিষ্ট ছিল। তিনি ভেবেছিলেন অনেকগুলি দেশের দল একসঙ্গে মিশে আছে। বিশ্বাস করলেন তখন যখন আমাদের দোভাষী তাঁকে ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিলেন। আমাদের দল বড় ছিল বলে দাইইচি হোটেলের চারতলা ও পাঁচতলা আমাদের জন্য নির্দিষ্ট হল। আমার ও কেম্পিয়ার জন্য নির্দিষ্ট হল একটি ঘর।

রাত তখন সাড়ে বারোটা হবে। প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ দরজায় ঠুকঠাক শব্দ। উঠে দরজা খুলতেই দেখি সামনে দাঁড়িয়ে আছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হাসান ও মুসা এবং মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ওমর। মাঠের মধ্যে মুসা যেভাবে পা চালিয়েছে এবং মুখ দিয়ে জ্বালিয়েছে, এখানেও সেইভাবেই জ্বালাল। বলল, "আরে তুমহারা টীম বহুত খারাপ হ্যায়, উসিলিয়ে হামলোগ আ গয়ে।" আমরা ভাবলুম হতেও পারে। দলের শক্তিবৃদ্ধির জন্যই বোধহয় এদের পাঠানো হয়েছে। কিন্তু ওমর ছিল খুবই শান্তশিষ্ট। কথাও কম বলত। তার কথাতেই প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম। সে জানাল, তারা পাকিস্তান দলে খেলবে, পাকিস্তান সরকার আগেই তাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন, পুরো দল আসবে কাল। তারা মাত্র তিনজন। কোন তলায় জায়গা পাবে জানে না। তাই আমাদের

কেম্পিয়া বীর বাহাদুর

সঙ্গেই রাত কাটাতে চায়। এমন কী, ঘরের মেঝেতে শুতেও তাদের আপত্তি নেই। শুনে আমরা খুশিই হলুম। সবাই আমরা বন্ধু। দুদিন পরে ওরা এক দেশের হয়ে, আমরা আর এক দেশের হয়ে মাঠে নামব। রাতটুকুর জন্য সঙ্গ পাই তো মন্দ কী! খেলাধুলোর এটাই তো বড় মজা। খেলতে-খেলতে কত নতুন বন্ধু পেয়েছি, কত পুরনো বন্ধুকে পেয়ে অতীতের সুখ-স্মৃতি চারণ করেছি। মুসা এল আমাদের ঘরে। পি কে ও নিখিল নন্দী তাদের ঘরে টেনে নিল ওমরকে। হাসানকে আতিথ্য দিল বলরাম ও দামোদরন।

টোকিওয় ফুটবল খেলার বিশদ বিবরণ দিতে গেলে লেখা অনেক বড় হয়ে যাবে। শুধু এইটুকু বলব, আগেরবার ম্যানিলা এশিয়ান গেমসে ভারত জাপানকে প্রথম খেলায় ৩—২ গোলে হারাবার পর দ্বিতীয় খেলায় ইন্দোনেশিয়ার কাছে ০—৪ গোলে হেরে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছিল। টোকিওয় চোদ্দটি দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরা অন্তত সেমি ফাইনালে খেলেছিলুম। তবু বলব, ফুটবলে এশিয়ার জাগ্রত শক্তির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে আমরা চলতে পারিনি। গ্রুপের প্রথম খেলায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে বর্মাকে হারিয়েছিলুম ৩—২ গোলে। আমি করেছিলুম একটি গোল, দামোদরন ও পি কে একটি করে। দ্বিতীয় খেলায় ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ড্র করে কোয়ার্টার ফাইনালে হংকংকে হারিয়েছিলুম ৫—২ গোলে। সেমি ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে ১—৩ ও তৃতীয়-চতুর্থ স্থান নির্ণয়ের খেলায় ইন্দোনেশিয়ার কাছে ১—৪ গোলে হেরে গিয়েছিলুম।

কোয়ার্টার ফাইনালে হংকংয়ের সঙ্গে খেলাটি আমাদের প্রত্যেকের জীবনের এক স্মরণীয় খেলা। তোমরা কি কোনোদিন দু ঘণ্টা পনেরো মিনিট ধরে একটি খেলা দেখেছ? আমি তো দেখিনি। খেলিওনি কোনদিন, ওই একদিন ছাড়া। কী হয়েছিল জানো? নির্ধারিত ৯০ মিনিটের খেলায় ফল রইল ২—২। তারপর প্রতি অর্ধের পনেরো মিনিট করে অতিরিক্ত তিরিশ মিনিটের খেলায় আর গোল হল না। তখন আবার সাড়ে সাত মিনিট করে অতিরিক্ত পনেরো মিনিট খেলানো হল। একশো কুড়ি মিনিটের পরই আমরা আধমরা হয়ে পড়েছিলুম। কলকাতায় তখন আমরা খেলতুম পঁচিশ মিনিট করে মাত্র পঞ্চাশ মিনিট। সেখানে একশো কুড়ি মিনিটের পর আমাদের কী অবস্থা হয়েছিল বুঝতেই পারছ। তারপর খেলতে হল আরো পনেরো মিনিট। কিন্তু ওই পনেরো মিনিটে অ্যাংলো-চাইনিজ খেলোয়াড় নিয়ে গড়া শক্তিশালী হংকং দলের বিরুদ্ধে তিনটি

গোল করেছিলুম। বলতে পারো মরণ কামড় দিয়েছিলুম। একটি গোল করেছিলুম আমি, একটি পি কে, একটি-রহমত-উল্লা। নির্দিষ্ট সময়ের খেলায় গোল করেছিল বলরাম ও দামোদরন।

আমাদের টোকিও যাত্রার আগে অনেকে আশা করেছিলেন ভারতীয় আক্রমণ-বিভাগ যখন রীতিমতন শক্তিশালী, তখন এবার স্বর্ণপদক নিয়ে ফিরবেই। টোকিওয় নিশ্চয়ই আমরা ভাল খেলতে পারিনি। কিন্তু যে-ভাবে আমরা খেলেছিলুম ও গোল করেছিলুম—বিশেষ করে বর্মার বিরুদ্ধে আমি ও বলরাম বল দেওয়া-নেওয়া করে, সে সম্পর্কে দু-একটি কথা তোমাদের বলব। তোমরা যখন খেলবে তখন কাজে লাগতে পারে।

দেশের মাঠেই হোক, কি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভিন দেশের মাঠেই হোক, আমরা যখন খেলেছি, খেলোয়াড়ের ধর্ম পুরোপুরি মেনে চলেছি। সে ধর্মটা কী? দলের স্বার্থ এবং খেলার গতি ও লক্ষ্যভেদী ভাবটাকে বজায় রেখে খেলা। সত্যি কথা, প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে আমরা সকলেই নিজ নিজ খেলা এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি. যেমন সব খেলায় সবাই করতে চায়। কিন্তু এমনভাবে কখনো খেলিনি, যাতে দলের ক্ষতি হয়। ঠিক সময় ঠিক লোকের কাছে বল পাস করেছি। যেখান থেকে গোলে শট নিলে গোল হবার সম্ভাবনা কম, সেখান থেকে শট না করে যে খেলোয়াড় ভাল পজিশনে আছে তাকে বল বাড়িয়ে দিয়েছি। বিনা প্রয়োজনে পায়ে বল রাখিনি। দলের স্বার্থে পি কে, বলরাম এবং আমি সব সময় এটা মেনে চলতে চেষ্টা করেছি। বলরামের ভাল বল-কন্ট্রোল ছিল। তাই একটু বেশি সময় পায়ে বল রাখত। আমিও রেখেছি। কিন্তু সেটা গ্যালারি থেকে হাততালি পাবার আশায় নয়, ডিফেন্সকে তছনছ করার চেষ্টায়, এবং দলের খেলোয়াড়কে ভাল জায়গায় পজিশন নেবার সুযোগ দেবার জন্য।

ফুটবলে চতুর্থ স্থান পাওয়ায় মনটা খারাপ ছিল। আরও খারাপ হল আন্তর্জাতিক হকিতে সর্বপ্রথম ভারত দ্বিতীয় ধাপে নেমে যাওয়ায়। ওখানেই ভারত প্রথম হেরে যায় পাকিস্তানের কাছে। অবশ্য কোনো খেলায় না হেরে, গোলের পার্থক্যে। তবু যারা ছিল হকি খেলায় তিরিশ বছর ধরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, তাদের দ্বিতীয় স্থান পাওয়া দারুণ দুঃখেরই ব্যাপার।

টোকিও এশিয়াডে ভারত পেয়েছিল পাঁচটি সোনা, চারটি রুপো ও চারটি ব্রোঞ্জের পদক। সব সোনাই পেয়েছিল আমাদের অ্যাথলীটরা। স্টেডিয়ামে কান-ফাটানো চিৎকার আর শ্বাস-রোধকারী উত্তেজনার মধ্যে মিলখা সিংয়ের দৌড়ের কথা মনে পড়ছে। পাকিস্তানের আব্দুল খালিক তখন এশিয়ার ক্ষিপ্রতম মানুষ। কিন্তু স্প্রিন্টের দুশো মিটারে খালিককে হার স্বীকার করতে হয় মিলখার কাছে। মিলখা সিং চারশো মিটারেও সোনা পান। নাম হয়ে যায় 'উড়ন্ত শিখ'।

আবার কেম্পিয়ার কথা মনে পড়ল। কেম্পিয়া ছিল ভোজন-রসিক। খেতও একটু বেশি। মুখের বুলি ছিল, 'বেশি খাও বেশি খেলো'। কলকাতায় আসার পর প্রথমে এই দুটি বাংলা বুলি শিখে নিয়েছিল। কটক ক্যাম্পে সেই যে আমি আলফা-লফা টনিক সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা বলেছি না, কেম্পিয়া তাও খেতে চাইল। সেটা কিন্তু ভোজনবিলাসী বলে নয়। যখন জানল ওই টনিকে শরীর ভাল হয় তখন তাকে ঠেকানো দায়। যাতে শরীর ভাল হয় তা সে খাবেই। খেয়েওছিল। টোকিও থেকে আসার আগে নাছোড়বান্দা হয়ে তার সওদা করার কথা জীবনে ভুলব না।

হংকং সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দূর প্রাচ্যের মার্কেটে কেনাকাটা করার অভিজ্ঞতায় আমরা বুঝে নিয়েছিলুম জিনিসের উপর যে দাম লেখা থাকে তার অর্ধেক থেকে দরদাম শুরু করতে হয়। জাপানের পুতুল বিখ্যাত। কেম্পিয়ার শখ হল একটি পুতুল কিনবে। টোকিওর বড় এক দোকানে ঢুকে ওর চক্ষু স্থির। সব পুতুলই যেন জীবন্ত। যেন কোলে উঠতে চায়। কোনটা কিনবে ভেবে পাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত একটি পছন্দ করতেই জাপানি সেলস গার্ল লেবেলটা দেখে দাম বললেন। কেম্পিয়া অর্ধেক দাম বলতেই মেয়েটি হেসে লুটোপুটি। তবু কেম্পিয়ার ধারণা, আর-একটু বাড়ালেই পুতুলটা কেনা যাবে। সেলস গার্লের কাছ থেকে সরে আসে আর পেছনে তাকায়, যদি হংকং ও সিঙ্গাপুরের মতো আবার ডাক আসে। সেদিন আমরা ফিরেই এলুম। দ্বিতীয় দিন আবার দোকানে গেলুম। কেম্পিয়া আবার সেলস গার্লকে অনুরোধ করল তার বলা দামে পুতুলটি দিয়ে দিতে। মেয়েটির মুখে এবার অল্প একটু হাসি ফুটে উঠল। আমরা ভাবলুম পাওয়া যাবে। কিন্তু বিফল হয়ে ফিরে আসতে হল। তখনো জানতুম না জাপানে দরাদরি নেই সব কিছুরই ফিক্সড প্রাইজ। কিন্তু কেম্পিয়া সত্যিই নাছোড়-বান্দা। মাঠে যেমন কখনো বল ছেড়ে দিত না, বলের সঙ্গে আঠার মতো লেগে থাকত, তেমন কোনো কিছুই ছেড়ে দিতে রাজি নয়। তৃতীয় দিন কেম্পিয়া আবার দোকানে ঢুকতেই সেলস গার্ল দৌড়ে এলেন। তাড়াতাড়ি উপরের র‍্যাক থেকে পছন্দ করা সেই পুতুলটি পেড়ে কেম্পিয়ার হাতে দিয়ে দুই হাত জোড় করে হিন্দিতে বললেন, "নমস্তে"।

(ক্রমশ)

গোপাল ভাঁড় আছেন...
বীরবল আছেন...
আর আছেন মোল্লা নসিরুদ্দীন
তাঁর বাছাই করা ১০১টি গল্প
আর খান ২০ ছবি নিয়ে

মোল্লা নসিরুদ্দীন জিন্দাবাদ

লেখা/ অংশু মিত্র
ছবি/ যুধাজিৎ সেনগুপ্ত
দাম/ পাঁচ টাকা

চটপট কিনে নিয়ে বছরের গোড়াতেই প্রাণখুলে হেসে নাও

আঞ্জন ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা ৭০০০০৯

উপন্যাস

ভুতুড়ে কুকুর

আশাপূর্ণা দেবী

আগে যা ঘটেছে

বজ্রাঙ্গসুন্দরের বয়স সত্তরের বেশি। ছবির মতো বাড়ি করেছেন। হঠাৎ একদিন বৈকালিক ভ্রমণ সেরে বাড়ি ফিরে একটি কুকুর দেখতে পান। মস্ত অ্যালসেশিয়ান, কিন্তু বেওয়ারিশ। না পুষলেও খাবার দিতে দোষ নেই। কিন্তু খাবার দিতে গিয়ে দেখেন, কুকুর বেপাত্তা। আর, তাঁর আলমারির গোপন গহ্বর থেকে 'যথাসর্বস্ব' উধাও। ওদিকে আবার জমাতা গোবিন্দগোপাল রাত্তিরে খাওয়ার পরে বাগানের মধ্যে কুকুর দেখল। গোবিন্দগোপাল চলে গেল বাড়ি ছেড়ে। তারপরেই টেলিগ্রাম গেল বেনারসে, বজ্রাঙ্গর ভাই সর্বাঙ্গ-ডাক্তারের কাছে। ভৈরব জ্যোতিষীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি কলকাতায় এলেন।

জ্যোতিষী গণনা করে বলে দিলেন যে, বড়কাবুর 'যথাসর্বস্ব' চুরি করেছে বাড়ির কাজের লোক ফটিক।' কিন্তু পুলিসে দেওয়ার জন্যে ফটিককে ধরতে গেলেই ও এক দৌড়ে চিলেকোঠায় ঢুকে খিল লাগিয়ে দিল ভেতর থেকে। বাইরে থেকে ঘরে তালা ঝোলালেন ডাক্তারবাবু। পরদিন পুলিসে দেওয়া হবে ফটিককে। কিন্তু পরদিন সকালবেলা রিংকুর বাবা চিলেকোঠার দরজা খুলবার পরেই দুদ্দাড়িয়ে নীচে নেমে এসে বুক চেপে ধরে শুয়ে পড়লেন। কী ব্যাপার! ফটিক কি বাবুর বুকে ধাক্কা মেরে ছিটকে পালিয়েছে? তারপর...

৫

"ধর্ ধর্। দামিনী, শিগগির দ্যাখ, গেট ডিঙিয়ে পালিয়ে গেল কি না।"

এতক্ষণে রিংকুর বাবা ভাঙা গলায় কষ্টে বলে উঠলেন, "পালায়নি। ঘরেই আছে।"

হ্যাঁ, ঘরেই রয়েছে ফটিক, সেই চিলেকোঠার ঘরে। পালায়নি।

অথবা পালিয়েই গেছে। গেট ডিঙিয়ে নয়, আরও অনেক দূর ডিঙিয়ে। হুড়মুড়িয়ে একসঙ্গে ছাতে উঠে এল সবাই, এসেই অমানুষিক একটা আর্তনাদ করে উঠল, তারপর স্রেফ স্ট্যাচু হয়ে গেল।

কে জানত, ওই মস্তান-মার্কা ফটিক ভিতরে ভিতরে এত অভিমানী! কিংবা এত প্রতিহিংসাপরায়ণ!

হ্যাঁ, ঘরেই রয়েছে ফটিক।

শুয়ে নয়, বসে নয়, দাঁড়িয়ে নয়, সীলিং থেকে ঝুলে।

জানলা-বন্ধ আধা-অন্ধকার ঘরের মধ্যে কালো র‍্যাপারে মুখমাথা সর্বাঙ্গ মুড়ে। ওঃ ওই ঝুলন্ত দেহটা কী ভয়াবহ, বীভৎস।

আরও ভয়াবহ মোজা-পরা দু'খানা পা। ...যা র‍্যাপারের নীচে থেকে অসহায়ভাবে দুলদুলিয়ে দুলছে।

★

শহরতলিও ছাড়িয়ে এবড়ো-খেবড়ো গেঁয়ো রাস্তার ধারে এক চালাঘরের চায়ের দোকানের সামনে নড়বড়ে কেঠো বেঞ্চের ওপর একটা মোটা, বেঁটে, কালো, টাক-মাথা লোক কাঁচের গেলাশে করে চা খাচ্ছিল। দূর থেকে দেখতে পেয়ে আনোয়ার মিস্ত্রির নাতি তোরাপ হনহনিয়ে তার সামনা-সামনি চলে এল।

তোরাপের হাতে যন্ত্রপাতির ঝুলি, পরনে প্যান্ট আর পাঞ্জাবি, পায়ে হাওয়াই চটি। বাপ-ঠাকুর্দার মতো লুঙ্গি পরে কাঁধে গামছা নিয়ে কাজ করে না তোরাপ, তবে হাতের কাজ বাপ ঠাকুর্দাকে ছাড়ায়। রাজমিস্ত্রির রাজ্যে তোরাপের ভারী নাম ডাক। এদিকে আসছিল তোরাপ একটা পুরনো জমিদার-বাড়িকে ভেঙে-চুরে আধুনিক প্যাটার্নে করাবার প্ল্যান দিতে। এখানে হঠাৎ ওই মোটা বেঁটে টেকোটাকে দেখতে পাবে তা ভাবেনি।

সামনা-সামনি এসেই চড়া গলায় বলে ওঠে, "বাড়ি গেলে তো দেখা হয় না, আমার পাওনার কী হল?"

টেকো থতমত খেয়ে বলে, "তুই? তুই এখানে?"

তোরাপ আরও গলা চড়ায়, "ও-কথা থাক। কাজের কথা বলুন। টাকা দেবেন কবে?"

টেকোও গরম হয়, "অত তেরিয়া কেন? আমি কি তোর টাকা মেরে দিয়ে পালিয়ে যাব?"

"যাবেন কি না তারই বা ঠিক কী।" তোরাপ কায়দা করে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটু বেঁকে দাঁড়িয়ে বলে, "মধ্যমগ্রামের সেই ব্যাপারটার তো আজ পর্যন্ত ঠিকমতো হিসেবই হল না। সে-কথা যাক, এখানে তো হিসেবের কিছু নাই, এক-একটা খবর সাপ্লাইয়ের জন্যে ক্যাশ দুশো করে টাকা, এই আমার রেট, এ তো আগেই বলেছি। তারপর খবর থেকে লাভ লোকসান বুঝে বখশিস, ব্যস।"

"খবর তুই সাপ্লাই করেছিস ঠিকই," টেকো খালি চায়ের গেলাশটা ঠক করে নামিয়ে রেখে বলে, "কিন্তু তোর পেছনে আমায় ঢালতেও তো কম হয়নি। ঝঞ্ঝাট কত, অথচ—"

তোরাপ এক-বগ্‌গার মতো বলে, "ও সব আমি জানি না. আমার পাওনা মিটিয়ে দিন, চুকে যাক।"

"দেব বাবা, দেব। কথা হচ্ছে—এখনো তো হাতে কিছু পেলাম না। এমন এক বিদঘুটে জিনিস জুটল—"

"সে আপনার বিজনেস, আপনি বুঝবেন। আমার টাকা আজই চাই।"

"ওঃ তোরাপ, তুই কী হলি রে? তোর বাবা-ঠাকুর্দা তো এমন মেজাজি ছিল না।"

তোরাপ গম্ভীর গলায় বলে "বাপ দাদা সরল পথে উপার্জন করে গেছে, মেজাজ ঠান্ডা রেখেছে, আমার পথ বাঁকাচোরা, কুটিল, আমার মেজাজ এই রকমই হবে। যাক, যাচ্ছি, সন্ধেবেলা টাকাটা ঠিক করে রাখবেন।"

হনহনিয়ে চলে যায় তোরাপ।

টেকো লোকটা মুখটা বেজার করে উঠে পড়ে ঘুরে চায়ের দোকানের পিছন দিকে গিয়ে আর-একটা চালাঘরের দরজা ঠেলে ঢুকে একখানা খাটিয়ায় বসে পড়ে। ঘরের অন্ধকার কোণে একটা ক্ষয়া, খর্বাকৃতি, অর্থাৎ ছোট্টমোট্ট মাপের লোক একসারসাইজ করছিল।

টেকো তাকে উদ্দেশ করে বলে ওঠে, "রাতদিন তোর খালি ওই কম্‌মো হর্তুকি! বোস তো একবার, কথা আছে"

লোকটা সরে আসে দু হাত টানটান করে ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে। বলে, "রাত-দিন? রাতটা পাচ্ছি কোথায়? সারারাত তো হাত-পা-বাঁধা হয়ে—"

"আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন তোরাপটা তো টাকা টাকা করে মহা ঝামেলা করছে—"

"আমিও করব।" লোকটা হাই তুলতে তুলতে বলে, "কতদিন ব্যাগার খাটা যায়?"

"ব্যাগার? ব্যাগার খাটছিস তুই? তুই বড় নেমকহারাম হর্তুকি, তোকে দিই না কিছু?"

"যা দাও তাতে পেট ভরে না।"

শিশুদের– কিশোরদের– যত ছোটদের বই

সত্যজিৎ রায়
বাদশাহী আংটি ৫·০০
এক ডজন গপ্‌পো ১০·০০
প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৫·০৩
গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৫·০৩
সোনার কেল্লা ৬·০০
বাক্স-রহস্য ৫·০০
কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৫·০০
সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬·০৩
রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫·০৩
আরো এক ডজন ১০·০০
জয় বাবা ফেলুনাথ ৬·০০
ফটিকচাঁদ ৮·০০
ফেলুদা এণ্ড কোং ৮·০০
মহাসংকটে শঙ্কু ৬·৭৩
শিবরাম চক্রবর্তী
হর্ষবর্ধন নিত্যনূতন ৪·০০
শিব্রামের বারো আড্ডি ৫·০০
দিগ্বিজয়ী হর্ষবর্ধন ৬·০০
এক মেয়ে ব্যোমকেশের কাহিনী ৬·০০
গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও মন্মথ চৌধুরী
নিশীত রাতের আহ্বান ৩·০০
গৌরকিশোর ঘোষ
দুষ্টুর দুপুর ৩·৭৩
আনন্দ বাগচী
বনের খাঁচায় ৫·০০
পার্থসারথি চক্রবর্তী
কেমিক্যাল ম্যাজিক ৪·০০
চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা ৪·০০
রসায়নের ভেল্‌কি ৩·০০
ম্যাজিকের মত মজা ৫·০০
তত সহজ ছিলনা ৫·০০
মৌমাছি (বিমল ঘোষ)
রাজার রাজা ৭·০০
শৈলেন ঘোষ
অরুণ বরুণ কিরণমালা ৩·০০
মিতুল নামে পুতুলটি ৪·০০
ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৬·০০
বাজনা ৫·০০
হুপ্পোকে নিয়ে গপ্পো ৫·০০
আমার নাম টায়রা ৫·০০
বুদ্ধদেব গুহ
ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫·০০
মউলির রাত ৫·০০
সুকুমার রায়
সমগ্র শিশুসাহিত্য ১০·০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (১ম) ২৫·০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (২য়) ৩০·০০
জীবজন্তু ৮·০০
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
ছেলেদের বিবেকানন্দ ২·০০
সরলাবালা সরকার
পিন্‌কুর ডাইরি ৩·০০
মনোজ বসু
ওস্তাদ নটবর ৬·০০
বিমল কর
ওআণ্ডার মামা ৬·০০
কাপালিকরা এখনও আছে ৭·০০
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
ভয়ের মুখোশ ৫·০০
পাথরের চোখ ৬·০০
সীমানা ছাড়িয়ে ৬·০০
পাঁচমুণ্ডীর আসর ৬·০০
ইন্দ্রমিত্র
বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৫·০০
শরৎ কথামালা ১০·০০

পাপু

তোমাদেরই এক ছোট্ট বন্ধুর নাম। মাত্র আট বছর ন মাস বেঁচে ছিল সে এই পৃথিবীতে। সেই পলকটুকুতে খেলাচ্ছলে যে-কল্পলোকের দুয়ার সে খুলে দিয়েছিল, তারই এক ঝলক 'পাপুর বই।' পাপুর আঁকা অজস্র ছবি এবং তার লেখা প্রচুর কবিতা-নাটক আর গল্প নিয়ে এই বই।

এমনই আরেকটি দারুণ বই— 'পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া।' এই বইতে রয়েছে পাপুর আঁকা দুরন্ত সব ছবি, এবং তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশের সব-পাপুদের জন্যে বাংলাদেশের আটত্রিশজন নামজাদা সাহিত্যিকের লেখা ছড়া আর রূপকথা।

পাপুর বই ৬.০০

পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ৫.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪৪৩৬২

শঙ্করীপ্রসাদ বসু
আমাদের নিবেদিতা ৬·০০
প্রেমেন্দ্র মিত্র
আগ্রা যখন টলমল ৫·০০
যাঁর নাম ঘনাদা ৫·০০
ঘনাদার ফুঁ ৬·০০
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ভূমিকম্পের পটভূমি ৪·০০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ভয়ংকর সুন্দর ৫·৩০
সত্যি রাজপুত্র ৫·৩৩
তিন নম্বর চোখ ৫·০০
হলদে বাড়ির রহস্য ও
দিনে ডাকাতি ৬·০০
সবুজদ্বীপের রাজা ৫·৩০
মতি নন্দী
ননীদা নট আউট ৪·০০
স্ট্রাইকার ৬·০০
স্টপার ১০·০০
কোনি ৬·০০
সমরজিৎ কর
একটি সংকেতের জন্যে ৬·০০
নারায়ণ চক্রবর্তী
হলদে সবুজ কৃস্ট্যাল ১০·০০
পূর্ণেন্দু পত্রী
কী করে কলকাতা হলো ৪·০০
ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৪·০০
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
ক্লাস সেভেনের মিস্টার শেক ৪·০০
লীলা মজুমদার
বাতাসবাড়ি ৪·০০
অমরনাথ রায়
দেশবিদেশের বিজ্ঞানী ১০·০০
আশাপূর্ণা দেবী
রাজকুমারের পোশাকে ৪·০০
সমরেশ বসু
মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৫·০০
অমিতাভ চৌধুরী
হেপান্তরের মাঠে ৩·০০
ননীগোপাল চক্রবর্তী
চরকা বুড়ী ৪·০০
যাদুঘরে চল যাই ৬·০০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
ঘণ্টাদার কাবলু কাকা ৫·০০
অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৬·০০
সমগ্র কিশোরসাহিত্য (প্রথম খণ্ড) ২০·০০
গিরিধারী কুণ্ডু
টংসা চু ৫·০০
সুবোধ ঘোষ
সেই অদ্ভুত অস্ত্রখনি ৫·০০
বিমল মিত্র
রাজা হওয়া ঝকমারি ৭·০০
শিশিরকুমার মজুমদার
তুফান দরিয়ার পরান মাঝি ৫·০০
অন্নদাশংকর রায়
হৈ রে বাবুই হৈ ৫·০০
মঞ্জিল সেন
ডাকাবুকো ৫·০০
রেবন্ত গোস্বামী
অরুমিতুদের কথা ৪·০০
শিশির কর
গঙ্গায় বাঘ ৪·০০
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি ৬·০০
অজেয় রায়
ফেরোমন ৬·০০

টেকো দুঃখের গলায় বলে, "তোদের সক্কলের পেট ভরুক আর আমি হতভাগাই শুকিয়ে মরি।" জিনিসটার তো এখনো পর্যন্ত কোনো ফয়সালাই হল না।"

"সে আমি কী করব। তোমার শখ। বলছি তো, আছাড় মেরে ভেঙে ফেলো।"

"মন লাগছে না রে। বড় ভাল জিনিস। তুই এত করলি, অথচ চাবিটা—"

হঠাৎ থেমে গেল টেকো।

গলা নামিয়ে বলল, "আশেপাশে কেউ নেই তো?"

ক্ষয়া লোকটা অগ্রাহ্যের গলায় বলল, "কে আবার থাকতে আসবে এখানে?"

"কেমন যেন শব্দ শুনলাম।"

"বাতাসে শুকনো পাতা ঝরছে।"

"আচ্ছা ঠিক আছে, চলি।"

ক্ষয়া লোকটা বলে ওঠে, "চলি কী ভণ্টাদা, আমার মজুরির কী হল?"

ভণ্টাদা রেগে উঠে বলে, "মজুরি আমি পকেটে নিয়ে বেড়াচ্ছি? ঠিক আছে, সেটাকে আছাড় মেরে ভেঙেই ফেলছি আজ।"

চলে যায় দুমদুম করে।

★

ফটিককে পুলিসের হাতে ধরে দেওয়ার কথা ছিল, আর পাছে পালায় বলে তালা দিয়ে রাখা হয়েছিল, তবু ফটিক পালিয়ে গেল, অথচ সেই পুলিসের হাতেই ধরে দিতে হচ্ছে তাকে। অদ্ভুত।

পুলিসকে খবর দেওয়া হয়েছে, তারা এসে ওই চিলে-কোঠার ঘরে ঢুকবে। ফটিককে ধরবে। এখন শুধু সবাই কাঠ হয়ে বসে আছে ছাতে, সিঁড়ির দরজায়। মাঝে মাঝে শুধু দু'চারটে অস্ফুট স্বগতোক্তি, প্রশ্ন : উত্তর।

"আচ্ছা এত গরমে মোজা পরেছিল কেন ফটিক? অত র‍্যাপারমুড়িই বা দিয়েছিল কেন?"

"ওই দুর্মতির চেষ্টা করতে গিয়ে খুব নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল বোধহয়, কাঁপুনি ধরেছিল, তাই...।"

"আহা—না না, বড় শখ করে ওই সবুজ ফুলকাটা মোজাটা কিনেছিল সেদিন, বাহার দেখে সবাই হেসেছি, সেই মোজাটা পরা হবে না, এই মন-কেমনেই চিরকালের মতো মোজাটা পরে নিল।...র‍্যাপারও তাই। র‍্যাপারটা ফটিককে কিনে দেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু গায়ে দিত না, সোয়েটার পরে স্মার্ট হয়ে বেড়াত, পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছি এ জীবনে আর গায়ে দেওয়া হল না, ভেবে—"

"ফটিক রে—" রিংকুর মা চুপি-চুপি কাঁদছেন, "কাল রাতের খাওয়াটাও যদি তুই খেয়ে যেতিস! কাল তোর

সব থেকে প্রিয় জিনিস—নারকেল দিয়ে ছোলার ডাল হয়েছিল, আর কিসমিস দিয়ে আমের চাটনি। ওই বাজে জ্যোতিষীটা চর্বচোষ্য করে খেল রে ফটিক। উঃ! আমি জোর করে চাবি খুলিয়ে তোকে খেতে দিলাম না।"

নীচের তলায় নিজের ঘরে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে হা-হুতাশ করছেন সিংহবাহিনী। দামিনী বাগানে বসে বিড়বিড় করছে। দুঃখের সময় পুরুষ মানুষদের মুখ দিয়ে সহজে মনের কথা বেরোয় না, কিন্তু মুখ দেখলে মনের দুঃখ বোঝা যায়। রিংকুর বড়দাদুর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে অনুতাপে একেবারে ভেঙে পড়েছেন। রিংকুর বাবার চোখমুখ বসা, রিংকুর নিজের দাদু মনে মনে নিজেকে চাবুক মারছেন।

কিন্তু ভৈরব জ্যোতিষী?

তিনি?

তিনি তো নেই।

সকাল বেলা ফটিকঘটিত এই দুঃসংবাদ শুনেই তিনি কোন ফাঁকে সকলের অলক্ষ্যে নিজের ক্যাম্বিসের ব্যাগটি নিয়ে চুপি চুপি-হাওয়া হয়ে গেছেন।

ভাগ্যিস রিংকুটা এখনও ঘুমোচ্ছে, তাই রক্ষে, তা নইলে আর ভৈরবকে হাওয়া হতে হত না। নির্ঘাত থান ইঁট ছুঁড়ে মেরে পা ভেঙে দিত তার।

রিংকুর বাবা ছেলের ঘরের দরজা-জানলাগুলো ভাল করে চেপে বন্ধ করে, পাখা খুলে দিয়ে চলে এসেছেন, আহা বেচারি যতক্ষণ ঘুমোয় ঘুমোক। সেইটুকুই শান্তি।

সিংহবাহিনী নেহাত তত তারস্বরে চেঁচাচ্ছেন না, তাই, না হলে রিংকুর বাবার সাবধানতা কি আর কাজে লাগত?

তবে ক্রমেই গলা চড়াচ্ছেন সিংহবাহিনী, "ওরে বাবা রে, সেই শয়তান কুকুর আরও কী অঘটন ঘটাবে জানি না রে, মাথাটা বন-বন করে ঘুরছে আমার। তা ওরে কুকুর রে। শুধু তোকেই বা দোষ দিচ্ছি কেন রে? সেই লক্ষ্মীছাড়া ভন্ড গনংকারটা যদি ছেলেটাকে বিনিদোষে চোর অপবাদ না দিত, তা হলে তো এমন কাজ করত না। ওরে অপয়া অগা পন্ডিত রে, কে তোকে আদর করে ডেকে এনেছিল রে!... আহা, ফটিক আমার কত্তামা বলতে অজ্ঞান হত, সাত চড়ে রা বেরোত না। সেই তোকে কিনা চোর বদনাম দেওয়া!... তোকে তালা দিয়ে বন্ধ করে না রেখে ওই অগা গনৎকারটাকেই তালা দিয়ে রাখল না কেন রে? ওকেই পুলিসে ধরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। সেই তো আসছেই পুলিস!"

পুলিস যে কেন আসছে, সেটা আর খেয়াল থাকে না সিংহবাহিনীর।

একটুক্ষণ নাকমুখ মুছতে সময় নেন, আবার বলে ওঠেন, "বাড়িসুদ্ধ সকলে চর্বচোষ্য খাওয়া হল, আর সেই ছেলেটাকে উপোস করিয়ে—ওঃ হোঃ হোঃ—এ বাড়ির সব্বাইকে পুলিসে ধরিয়ে দেওয়া উচিত—"

চুপি-চুপি ক্রমেই সশব্দে হচ্ছে, উচ্চগ্রামে উঠছে।

এই সময় পুলিসের দল এসে পড়ল হুড়মুড়িয়ে।

ইন্সপেকটর ঘনশ্যাম বড়াল বাড়ি ঢুকেই সিংহবাহিনীর ওই ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পেলেন। থমকে বললেন, "কেন? সব্বাইকে পুলিসে দেওয়া উচিত কেন?"

ডাক্তার বটব্যাল তাড়াতাড়ি বলে দিলেন, "ওঁর কথা বাদ দিন, একশোর কাছে বয়েস, ভুলভাল কথা বলে ফেলেন।"

যাক বাবা, ভাগ্যিস জেঠিমার বয়েসটা মনে পড়ে গেল।

ঘনশ্যাম চিলেকোঠার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে খাতা কলম নিতে গিয়ে প্রশ্ন করেন, "এ আপনাদের সার্ভেন্ট?"

বজ্রাঙ্গ মলিন মুখে বলেন, "সার্ভেন্ট বললে সার্ভেন্ট, বাড়ির ছেলে বললে বাড়ির ছেলে।"

ঘনশ্যাম ধমকে ওঠেন, "কী বললে কী হয় তা জানবার দরকার নেই আমার। আসলে সার্ভেন্ট কি না?"

"হ্যাঁ।"

"কতদিন কাজ করছে আপনার বাড়ি?"

"অনেকদিন। এতটুকু বেলা থেকে।"

"ওঃ। অথচ তার সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার করলেন যে, বেচারি সুইসাইড করে বসল।"

হায়! হাতি কাদায় পড়লে, ব্যাঙও তাকে ধরে লাথি মারে।... নইলে চিরকালের নাক-উঁচু মিলিটারি-ম্যান বজ্রাঙ্গ বটব্যাল, তাঁকে কিনা অপদস্থ করে পার পায় ওই নাক-থ্যাঁদা ভুঁদো ঘনশ্যাম বড়াল!

উপায় কী।

বজ্রাঙ্গ গম্ভীর ভাবে বলেন, "বেশ তো, আমাকে অ্যারেস্ট করুন।"

"শুধু আপনাকে কেন, বাড়ির সকলের ওপরই চার্জ আসবে, আমার লাইফে আমি কখনো কোনো বাড়ির সার্ভেন্টকে সুইসাইড করতে শুনিনি। মনিবের সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে পালাতে দেখেছি, রাগের বশে মনিবকে খুন করে পালাতে দেখেছি, কিন্তু নিজে গলায় দড়ি? উঃ ইঁ!...যাক, ওর বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে?"

"বাড়ি!"

রিংকুর বাবা তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, "ও তো এইখানেই থাকত!

"ওঃ! তা এখানেই জন্মায়নি নিশ্চয়? দেশ গ্রাম একটা আছে অবশ্যই?"

"তা তো থাকবেই।"

ঘনশ্যাম চিবিয়ে-চিবিয়ে বলেন, "তা, সেখানে একটা খবর দেওয়া দরকার মনে করেননি?"

"সেখানে!"

গৌরাঙ্গ বজ্রাঙ্গর মুখের দিকে, বজ্রাঙ্গ গৌরাঙ্গর মুখের দিকে বোকার মতো তাকান, "সেখানে কী করে খবর দেওয়া যাবে?"

"যাবে না? কিন্তু আমাদের আইন বলে, দেওয়া দরকার। মৃতের আত্মীয়দের না জানিয়ে লাশ জ্বালিয়ে ফেলা বেআইনি। খবর পাঠান, খবর পাঠান।"

বজ্রাঙ্গ আর রেগে না উঠে পারেন না, "কোথায় খবর পাঠাব? আমি তার ঠিকানা জানি?"

"ওঃ। ঠিকানাও জানেন না! বাঃ। চমৎকার। এখন যদি ওর আত্মীয়রা কেউ এসে ওর গলায় দড়ির অপরাধে আপনাদের হাতে দড়ি দিতে চায়, আমি কিন্তু আটকাতে পারব না।"

বজ্রাঙ্গ কড়া গলায় বলেন, "কে বলেছে আটকাতে? বলছি তো, আমায় হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যান।"

"তাছাড়া কিছু করার নেই আমার।"

বলে মসমসিয়ে ওই ভয়ংকর ঘরটায় ঢুকে পড়েন ঘনশ্যাম, সঙ্গে-সঙ্গে অন্য পুলিস দুটোও।

ঘনশ্যাম দাঁতে দাঁত চেপে বলেন, "নামা।"

ওরা ধারালো বঁটি নিয়ে এগিয়ে আসে। মাটিতে কাত হয়ে পড়ে থাকা টুলটাকে দাঁড় করিয়ে তার উপরে উঠে দড়ি কেটে দেয়, ধপাস করে মাটিতে পড়ে যায় ফটিকের লাশ।

(ক্রমশ)

ছবি সুধীর মৈত্র

গোয়েন্দা বাজ

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

তোমাদের পাতা

চিঠি

আমি দুর্গাপুরে থাকি। আমি মাসিক আনন্দমেলা'র গ্রাহক। এই পত্রিকাটি আমি খুব ভালবাসি। আমাদের বাড়ির সকলের পড়া হয়ে গেলে আমার বন্ধু গৌতম পত্রিকাটি নিয়ে যায়। মাসিক আনন্দমেলা তারও খুব ভাল লাগে। এক সপ্তাহের মধ্যে সকলের পড়া হয়ে যায়। পরের সংখ্যার জন্যে তখন অপেক্ষা করতে হয়। মনে হয়, দীর্ঘদিনের অপেক্ষা। আচ্ছা, এই পত্রিকাটি পাক্ষিক করেন না কেন?

সুবীর পাল (বয়স-১৫)

মাসিক আনন্দমেলার মতো আর কোনো পত্রিকা আমার মনে দাগ কাটতে পারেনি। পত্রিকাটি এত সুন্দর যে আমি বারবার পড়তে বাধ্য হই। আপনাদের কাছে অনুরোধ, পত্রিকাটিকে পাক্ষিক করুন। তাহলে, আমার মতো অসংখ্য অনুরাগী পাঠক কৃতজ্ঞ হবে। পত্রিকাটির লেখাপড়া বিভাগটি আমাকে প্রচণ্ড টানে

দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায় (বয়স-১৪)

উলটো কথা

আমাদের ভাই সবে কথা বলতে শিখেছে। তবে অনেক কথাই সে উলটো করে বলে। যেমন 'চুলকে দাও'-কে বলে কুলচে দাও। বুধন নামে একজন লোক আছে, তাকে সে ডাকে 'বুনধ' বলে।

একদিন আমি ইস্কুল থেকে এসে দেখি, ভাই 'কচ্ দাও, কচ্ দাও' বলে খুব বায়না ধরেছে। মা এটা-সেটা দিচ্ছে, কিন্তু ভাই কিছুতেই থামছে না। আমি পকেট থেকে ছোট্ট এক টুকরো চক্ বের করে ভাইয়ের হাতে দিলাম। ব্যস্, ভাই এক সেকেণ্ডে শান্ত হয়ে গেল।

অভিশপ্তা পাল (বয়স-৯)

এক যে ছিল শেয়াল

এক যে ছিল শেয়াল
রাজার বাড়ির দারোয়ানটা
ধরলে রাতে খেয়াল
চুপি চুপি হঠাৎ এসে
টপকাত সে দেয়াল।
এক যে ছিল শেয়াল।

রাজার বাড়ির মুরগিশালায়
দিয়ে হঠাৎ হানা
মুখে তুলে নিত সে যে
গোটা কয়েক ছানা।
তারপরে সে খুশি মনে
পেরিয়ে যেত দেয়াল।
এক যে ছিল শেয়াল।

সঞ্জিত রায় (বয়স—১২)

ছবি এঁকেছে **অদিতি ঘোষ** (বয়স ৬)

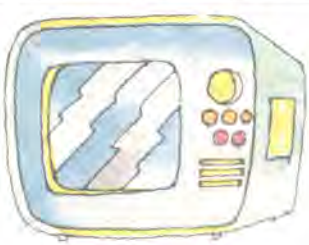

টি. ভি

কাচের মধ্যে কী যে হচ্ছে
বুঝতে আমি পারছি—
ছবি চলছে কথা হচ্ছে
অবাক আমি হচ্ছি।
হঠাৎ দেখি কাচের মধ্যে
হচ্ছে ঘুষোঘুষি
'দেখবে' বলে চেঁচিয়ে ওঠে
আমার ছোটমাসি॥

সুশোভন সরকার (বয়স—১১)

কার্লোর স্বপ্ন

কার্লো বলে একটি ছেলে ছিল। তার বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না। সে সকাল বিকাল শুধু ছাগল চরাত ও ছাগলের দুধ বিক্রি করত। একদিন কার্লো ছাগল চরিয়ে বাড়ি ঢুকছে এমন সময় ওর পায়ের কাছে একটা তীরে-বাঁধা চিঠি এসে পড়ল। তাই দেখে কার্লো খুব অবাক হল। সে চিঠিটা খুলে পড়ল। তাতে লেখা আছে : "কার্লো, তুমি ছাগলগুলো আমাদের দিয়ে দিও। ইতি, মার্লো।"

কার্লোদেরই পাশের বাড়িতে মার্লোরা থাকত। কিন্তু মার্লোদের বাড়ির সবাই তো মারা গেছে! তাহলে কি মার্লোদের আত্মা চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

কিছুক্ষণ পরে কার্লো অবাক হয়ে দেখল যে, পাঁচটা ছাগলের দুটো নেই। আরও কিছুক্ষণ পরে দেখল, বাকি তিনটে ছাগলও নেই। হঠাৎ কিসের ধাক্কায় ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখে যে, সে বাড়িতে শুয়ে আছে, আর তাদের একটা ছাগল তাকে ঢুঁ মারছে।

কৌশিক দত্ত (বয়স—৯)

ট্যাক্সি চড়ে

ম্যাক্সি পরে ট্যাক্সি চড়ে
যাব মামার বাড়ি,
মামার বাড়ি গিয়ে এবার
পরব আমি শাড়ি,
শাড়ি পরে ট্যাক্সি চড়ে
ফিরব আবার বাড়ি।

সুতপা বসু (বয়স—১১)

আমার পাখি

একটি আছে ছোট্ট চড়ুই পাখি
তাকে আমি পাপিয়া বলে ডাকি।
সে উড়ে বেড়ায় সকালবেলা
দুপুরবেলা সন্ধ্যাবেলা—
যখন-তখন খায় ছোলা।

রাখী পাল (বয়স—১২)

নারকেলের দ্বীপমালা

অভী দাশ

প্রাচীনকালে আমাদের এই দেশেরই মানুষ সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বহু দূর দূর দেশে গিয়েছে। বাণিজ্যে, ধর্মপ্রচারে, সংস্কৃতির প্রসারে। সিংহল, সুমাত্রা, জাভা, ইন্দোচীনে তার চিহ্ন আজও ছড়িয়ে রয়েছে। তারপর জাতির আত্মশক্তি যত কমেছে, সভ্যতার দীপ ম্লান হয়ে এসেছে, ততই সংস্কারের বেড়াজাল তাকে ঘিরে ধরেছে। হঠাৎ একদিন সমুদ্রযাত্রা হল নিষিদ্ধ। নিষেধের প্রাচীর তুলে দিয়ে সমুদ্রের নাম দেওয়া হল কালাপানি। পেরোলেই নাকি জাত যাবে, ধর্ম যাবে।

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম—সিপাহী বিদ্রোহে যে-সব সিপাহীকে বন্দী করে ইংরেজরা শাস্তি দিয়েছিল যাবজ্জীবন কারাবাসের, তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কালাপানির ওপারে—আন্দামানে। সেখান থেকে পালানো সম্ভব নয়। যদি বা কেউ পালিয়ে দেশে ফিরতেও পারে তবু তার নিজের সমাজই তাকে গ্রহণ করবে না। সে তো কালাপানি পাড়ি দিয়েছে। তার জাত গেছে, ধর্ম গেছে। তাকে কী করে আর ঘরে নেওয়া যায়। এক সময়ে আন্দামান হয়ে উঠেছিল বাংলার বীর বিপ্লবীদের দ্বীপান্তরের একমাত্র স্থান।

রামায়ণে দূরবর্তী এক দ্বীপপুঞ্জকে হনুমানের দেশ বলা হয়েছে। মালয়বাসীরা তাকে বলত হন্দুমান। ক্রমে নাকি তার থেকেই এর নাম হয়েছে আন্দামান। নীল সমুদ্রের মাঝে ছেঁড়া এক ছড়া ঘন সবুজ মালার মতো ছড়িয়ে আছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। ছোট বড় ৩১৯টি দ্বীপ আছে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপমালায়। এ ছাড়া চারদিকে ছড়ানো-ছিটানো রয়েছে প্রায় ২৫০টি মাথা-জাগানো সামুদ্রিক পাহাড়। এর অল্প কয়টিতে মানুষের বসবাস। বাকিগুলি জন-শূন্য, প্রাণী-শূন্য, ঘন অরণ্য মাত্র।

ভূতাত্ত্বিকদের মতে, পৃথিবীর আদি যুগে এই দ্বীপমালা ছিল ব্রহ্মদেশের উপকূলবর্তী এক দীর্ঘ পর্বতমালা। দেড় কোটি বছর আগে প্রবল ভূকম্পনে এটি বসে গিয়ে সমুদ্রের দিকে সরে যায়। গড়ে ওঠে এই দ্বীপপুঞ্জ। ব্রহ্মদেশের উপকূল থেকে এর সবচেয়ে কম দূরত্ব হল ১৯৩ কিলোমিটার; ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপ থেকে ১৪৬ কিলোমিটার; মাদ্রাজ থেকে ১২০০ কিলোমিটার; আর কলকাতা থেকে ১০৯০ কিলোমিটার। ১৯৭১-এর জনগণনা অনুযায়ী, এই দ্বীপপুঞ্জের লোকসংখ্যা এক লক্ষ পনের হাজার। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মতে, এখন এর লোকসংখ্যা দেড় লক্ষের কিছু বেশি।

দ্বীপপুঞ্জটি বিষুব রেখার খুব কাছে। ৬ থেকে ১৪ ডিগ্রি অক্ষাংশের মধ্যে। তাই এটি চির-সবুজ, চির-বসন্তের দেশ। না, কথাটি ঠিক হল না। বরং বলা উচিত বৃষ্টির দেশ। বর্ষাকাল বছরের সাত মাস জুড়ে। মে মাসে শুরু। বিদায় নেয় নভেম্বরের প্রথমে। তখন মাঝে-মধ্যে ঝড়-তুফান তো আছে-ই। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক সমুদ্রাঞ্চলের একটি। অতীতে কত যে জাহাজ-ডুবি হয়েছে এখানে তার হিসেব নেই। এখনও যে হয় না, এমন নয়।

তবে এখানে শীতকাল বলে কিছু নেই। বছরের তাপমাত্রা সবচেয়ে নীচে নামে ডিসেম্বরে—৭০ ডিগ্রি (ফাঃ), আর সবচেয়ে ওপরে ওঠে এপ্রিলে—৯৭ ডিগ্রি। তাই এর প্রতিটি দ্বীপ গভীর অরণ্যে ঢাকা। বড় বড় আদিম গাছ। সেগুলিকে জড়িয়ে আছে অসংখ্য লতা, পরগাছা। বনজঙ্গল ভেদ করে ভেতরে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। তা ছাড়া আছে মশা-মাছি, বিষাক্ত পোকা-মাকড়। তবে হিংস্র জন্তু নেই। কোনো-কোনো দ্বীপে আছে বুনো শুয়োর, বনবেড়াল। কয়েকটি দ্বীপে হরিণ ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এখন তাদের সংখ্যা অনেক। আজকাল বাজারে হরিণের মাংস বিক্রি হয়। হরিণের চামড়াও পাওয়া যায়। এক-একটির দাম মাত্র ১৫ থেকে ২৫ টাকা।

আদিম অরণ্য আছে বলে এখানে বহু মূল্যবান কাঠ পাওয়া যায়। যেমন, মার্বেল কাঠ, সাটিন কাঠ। এ ছাড়াও আছে মহুয়া গর্জন এবং আরও অনেক। কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর হল নীল সমুদ্রের তীর বরাবর অজস্র নারকেল, সুপারির সারি। দশ বারো রকমের নারকেল হয়। কোনোটি খুবই ছোট, কোনোটি লম্বা, কোনোটি সুগোল, আবার কোনোটি আকারে বিশাল। সুপুরিও খুব বড়-বড় হয়। এক-একটি একশো গ্রামের মতো। কলা, পেঁপে, আম, কাঁঠালও জন্মে। এখন বনের কাঠ কাটা আর কাঠ চেরাই হল আন্দামানের প্রধান শিল্প। সমুদ্রের তীরে বহু বিচিত্র রকমের শঙ্খ ও কড়ি পাওয়া যায়। এ-সব দিয়ে স্থানীয় লোকেরা ছাইদানি, টেবিল-ল্যাম্প, পুতুল তৈরি করে।

অতীতে আন্দামানে কোনো ফসলের আবাদ হত না। দ্বীপের আদিবাসীরা আবাদ করতে জানত না। প্রয়োজনও ছিল না। নারকেল, বুনো ফল, মধু, সমুদ্রের মাছ, কাঁকড়া আর বনের শুয়োর খেয়ে জীবন কেটে যেত। আজও তারা সেই আদিম জীবন যাপন করছে। জামাকাপড় পরে না। তীরধনুক দিয়ে শিকার করে বেড়ায়। জারোয়া আদিবাসীরা হিংস্র প্রকৃতির। সভ্য মানুষদের তারা বিশ্বাস করে না, সহ্য করতে পারে না। আজও মাঝে মাঝেই দু' একজনকে প্রাণ দিতে হয় তাদের হাতে। খুব সম্প্রতি নৃতত্ত্ব সমীক্ষার একদল কর্মী ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছেন। নিকোবরের ওঙ্গি, নিকোবারি প্রভৃতি আদিবাসী শান্ত প্রকৃতির। সভ্য মানুষের সঙ্গে এখানকার আদিবাসীদের যোগাযোগ খুব সুখের হয়নি। সভ্য মানুষ বয়ে নিয়ে এসেছে কঠিন রোগ। বারোটি আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে ছয়টি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। বাকিগুলির সংখ্যাও ক্রমেই কমে যাচ্ছে। কোনও গোষ্ঠীর মোট সংখ্যা এক শয়েরও কম। এদের বাঁচিয়ে রাখাই কঠিন সমস্যা।

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে এখানে সভ্য মানুষের বসবাস শুরু হয়। এখন এখানে ভারতের প্রায় সব রাজ্যেরই কিছু-না-কিছু লোক আছে। বাঙালি, তেলেঙ্গি, মালায়ালি, বেহারি, ওড়িয়া, পাঞ্জাবি, মারাঠি ইত্যাদি। এক কথায় আজকের আন্দামান ভারতের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ।

স্বাধীনতার পর থেকে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের এখানে আনা শুরু হয়। বিভিন্ন দ্বীপে এরা বসতি স্থাপন করেছে। মধ্য আন্দামান দ্বীপেই আছে সবচেয়ে বেশি উদ্বাস্তু। এরা বেশ

কয়েকটি পল্লী গড়ে তুলেছে—তার এক ধারে নীল সমুদ্র, অপর দিকে সবুজ পাহাড়। এই দ্বীপের উত্তর প্রান্তে রয়েছে মায়াবন্দর। সবুজ নারকেল গাছের সারি আর লাল ফুলে ভরা কৃষ্ণচূড়ার ডালের মধ্য দিয়ে নীল সমুদ্রের কোলে ছোট্ট বন্দরটিকে কী চমৎকার দেখায়। উদ্বাস্তুরা ধান আবাদ করছে। ভাল ফসল ঘরে তুলছে। কত রকমের তরিতরকারিও চাষ করছে। এমন কী কপিরও চাষ শুরু করেছে, যা আন্দামানে আগে কখনও হয়নি। পল্লীর পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ চোখে পড়ে সবুজ গাছের নীচে পানের বরোজ।

সারা আন্দামানে কিন্তু একটিও নদী নেই। বড় বড় দ্বীপগুলিতে ঝরনা আছে। বাঁধ দিয়ে তার জল ধরে রেখে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। কোনো কোনো জায়গায় কুয়ো খুঁড়ে পানীয় জলের অভাব মেটানো হয়েছে। নলকূপ বসান চলে না। কেননা, মাটির স্তর অগভীর। কয়েক হাত নীচেই আছে কঠিন পাথরের স্তর।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে বড় দ্বীপ হল দক্ষিণ আন্দামান। ৮৪ কিলোমিটার দীর্ঘ। দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী ও প্রধান শহর পোর্টব্লেয়ার এই দ্বীপের পূর্ব প্রান্তে। খুব সুন্দর শহর। উপকূলে নারকেলের সারি। গাছপালা-ছাওয়া ছোট ছোট পাহাড় ছড়িয়ে আছে চারদিকে। অনেক জায়গাতেই সমুদ্রের খাঁড়ি অনেক দূর ভেতরে চলে গিয়েছে। এরই কয়েকটিতে রয়েছে পোতাশ্রয়। শহর থেকে বেশ কিছু দূরে দুই পাহাড়ের মাঝখানে বাঁধ দিয়ে ঝরনার জল ধরে রাখা হয়েছে। নল দিয়ে এই জল শহরে নিয়ে যাওয়া হয়। গোটা শহরে জল সরবরাহের এটিই একমাত্র উৎস। কাজেই শুকনো মরশুমে শহরে জলের বেশ অভাব।

সমুদ্র-উপকূলের পাশ দিয়ে রয়েছে পিচ-ঢালা রাস্তা। আবার ছোট ছোট পাহাড়ের গা-ঘেঁষে এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে অনেক দূরে। সমুদ্রের ধারে ছোট একটি পাহাড়ের উপরে সরকারি সার্কিট হাউস। তার একটু নীচে গেস্ট হাউস বা অতিথি ভবন। ঠিক সমুদ্র-তীরে ট্যুরিস্ট লজ। একটু দূরে বিখ্যাত বেলাভূমির দিকে মুখ করে পাহাড়ের কোলে একটি আধুনিক হোটেল গড়ে তোলা হচ্ছে। শহরের মধ্যে কয়েকটি বেসরকারি হোটেলও অবশ্য রয়েছে। প্রধান প্রধান সড়ক দিয়ে সরকারি বাস চলাচল করে। ট্যাক্সিও পাওয়া যায়। এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যাবার জন্য রয়েছে লঞ্চ। এগুলি সপ্তাহে একবার করে যায়। পোর্টব্লেয়ার থেকে কলকাতা ও মাদ্রাজের মধ্যে দুটি জাহাজ নিয়মিতভাবে চলাচল করে। এখন কলকাতা ও পোর্টব্লেয়ারের মধ্যে বোয়িং বিমান চলছে। সপ্তাহে দু দিন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানিরা আন্দামান দখল করে নিয়েছিল। একটি গুলিও খরচ করতে হয়নি তাদের (২৩শে মার্চ ১৯৪২)। পোর্টব্লেয়ার সুরক্ষার জন্য জাপানিরা সমুদ্রতীর বরাবর পাকা সড়ক নির্মাণ করে তার পাশে-পাশে সমুদ্রতীরে পাহাড়ের খাঁজে-খাঁজে তৈরি করেছিল বাংকার। সেগুলি এখনও আছে। নেতাজি পোর্টব্লেয়ার পরিদর্শনে আসেন ১৯৪৩-এর ২৯শে ডিসেম্বরে।

তিনি এখানে স্বাধীন ভারতের প্রথম পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। সেই স্মৃতি রক্ষার্থে পোর্টব্লেয়ারে সমুদ্রের তীরে নেতাজির মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ভারতের এক বীর সেনানী আজও যেন সুদূর সমুদ্রের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতার প্রতি তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেছেন।

তোতনের ভাবনা

(উল্টাডাঙ্গার এক স্কুলের ক্লাস ফোরের ছাত্র)

কাক ভোরেই মা ডাকাডাকি করছেন উঠে পড়তে বসার জন্য। আর শীতটাও এমন পড়েছে না! খুব বিরক্ত মুখে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে তোতন ভাবল কেন যে স্কুলের ফাইন্যাল পরীক্ষা এ সময় হয়?

পড়তে বসেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। বুলানের কাঁদ কাঁদ কথাগুলি মনে পড়ল। "তোতনদা ক্লাস থ্রির কয়েকটা বই যোগাড় করে দিতে পার? এবারের বৃষ্টিটায় আমাদের বস্তীতে খুব জল জমেছিল, আর জানো, তাতে আমার সমস্ত বই-খাতা নষ্ট হয়ে গেছে।"

ইস্, কলকাতা শহরে বুলানের মত হয়ত অনেক ছেলেমেয়েই এবার পরীক্ষা দিতে পারবে না—তোতন ভাবল। আজ স্কুলে গিয়েই ও গত বছরের বইগুলো আর বাড়তি খাতা, পেন্সিল বুলানকে দেবে। ক্লাসের বন্ধুদের বলবে স্কুলের গরীব ছেলেমেয়েদের দরকারী বইখাতা দিতে। আর টিফিনের পয়সা থেকে কিছু জমিয়ে আশেপাশের ক্ষতিগ্রস্ত স্কুল ও ছাত্র-ছাত্রীদের ওরা এখনই সাহায্য করবে।

কিছু করতে পারবে ভেবেই তোতনের মনটা খুশীতে ভরে উঠল।

এই কলকাতা শহরে আমরা একে অপরকে সাহায্য করি। এটা কলকাতার বৈশিষ্ট্য। ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সি, এম, ডি, এ) চায় তোমাদের কলকাতার এই বৈশিষ্ট্যটুকু বজায় থাকুক।

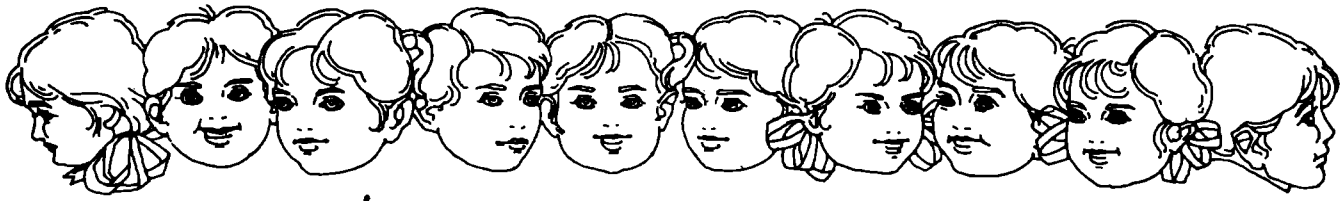

ঘটির মধ্যে মাছ

কুন্তক

বৌদি বললেন : আসল কথা কী জানো, বাংলায় আমরা উচ্চারণ করি একরকম, লিখি আরেকরকম বা হরেকরকম, এই-জন্যেই বানান নিয়ে এত অশান্তি।

এ-কথার কী মানে হল?

হল না কোনো মানে? ধরো, যেমন বলছি জখম তেমনি বলছি জখন, কিন্তু লিখবার বেলায় কেন লিখতে হবে জখম আর যখন? এইরকমই ঝামেলা ন নিয়ে, স নিয়ে। বিত্ত আর নিত্য তো একই ধরনের উচ্চারণ? অথচ লিখতে হবে দুরকম। অলোক বললে অলক লিখি না কি অলোক লিখি, এই এক সমস্যা। আরো কত সব তো শোনালে এতদিন। ঝামেলা নয়?

ও, ঝামেলা? হ্যাঁ, ঝামেলা একটু আছে তা সত্যি। সে কথা যদি বলো, সব ভাষাতেই এমন ঝামেলা অল্পবিস্তর থেকে যায়। একজন আধুনিক কবির লাইন আছে: 'কিছুই সহজ নয়, কিছুই সহজ নয় আর।' ভাষাতেই যে সহজে পার পেয়ে যাবে, তার উপায় কী!

সব ভাষাতেই? ইংরেজিতে মোটেই এমন নয়।—বলে উঠল নন্তু।

নয় বুঝি?

নয়ই তো। ব উচ্চারণকে b দিয়ে লিখলেই চলে। ক উচ্চারণকে k।

এটা কে বলল রে? কে?

আমি বলছি।

তুই বলছিস? ছোটবেলার পড়া ভুলে গেলি, B A T ব্যাট, CAT ক্যাট?

ও, হ্যাঁ। ক বললে k বা c।

মানে c দিয়ে ক হয়, এই তো বলছিস? city তবে কিটি না সিটি?

ও। স-এর জন্যও c বলা যায়। যাই হোক, c দিয়ে হল ক আর স।

কিন্তু Saw? সে তো c দিয়ে নয়, s দিয়ে।

এবার একটু থমকে গেল নন্তু। টুম্পি হাততালি দিয়ে বলল : বা, ভারী মজা তো! আরো বলো না এরকম।

আরো বলব? বরং মজার গল্প শোন্ একটা। Saw-এর কথায় মনে পড়ল শ-এর কথা। বার্নার্ড শ-এর নাম জানিস তো? বড় একজন নাট্যকার ছিলেন। ওঁর নামে একটা গল্প চলে। উনি নাকি বলতেন যে, ইংরেজিই হচ্ছে একমাত্র ভাষা যার বানানের কোনো মাথামুণ্ডু নেই।

সে কী! কেন তা বলতেন?

কেন? উনি বলতেন, ইংরেজি হল এমন ভাষা যেখানে fish লিখতে গিয়ে ghoti লিখলেও চলে।

ও আবার কী কথা? ঘটি লিখলে ফিশ হবে?

কেন হবে না?

কেন হবে?

gh-এর উচ্চারণ কী?

ঘ।

ঘ? তাহলে l a u g h—কী হল?

লাফ্।

তাহলে gh কী হল? ঘ না ফ? ফ তো?

ও, আচ্ছা! তারপর?

তারপর? o-এর উচ্চারণ কী?

কী?

ই নয়? W o m e n তো উইমেন? তাহলে o থেকে ই হল না?

কী কান্ড!

আর S t a t i o n থেকে পাবি ti-এর উচ্চারণ। কী হল ti? শ হল না? কাজেই g h o t i হল ফ্ ই শ্ অর্থাৎ ফিশ। ঘটির মধ্যেই মাছ।

নন্তু বলল : এক ঘটি মাছ। এ নিশ্চয় তবে কই মাছ। যাক, কেবল বাংলা নিয়েই তবে সমস্যা নয়। মস্ত একটা সান্ত্বনা পাওয়া গেল।

ওরে বাবা, ওই শব্দটা বলিস না দাদা। বড় শক্ত বানান।

বলছি তো শুধু। লিখছি না তো। আমি ভেবে রেখেছি, এখন থেকে কিছুই আর লিখব না। না বাংলা না ইংরেজি। কোনো বেটার ধার ধারি না, সব বেটাকেই চিনি। ওই-যে বলে না 'পেটে এক মুখে এক' এ হচ্ছে একেবারে তাই। গোটা বানান ব্যাপারটাই বাজে। করুণ সুরে বাজে। চললাম আমি কাকু।

সারির যোদ্ধারা, তোমরা আমাদের সাহায্য করতে এসেছ, তার জন্য ধন্যবাদ!
কিন্তু তোমরা মরবার জন্যে এত ব্যস্ত কেন? এ-যুদ্ধে জেতা তো সম্ভব নয়!
টারজান
এডগার রাইস বারোজ

সর্পমানবরা আমাদের আক্রমণ করেছে। বরাবরই তারা নিষ্ঠুর, কিন্তু জলাভূমি ছেড়ে তারা বড়-একটা বার হয় না। আজকে বার হল কেন?

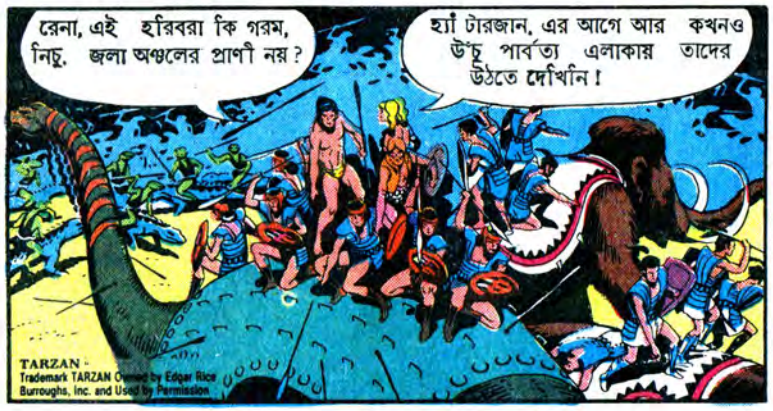
রেনা, এই হরিবরা কি গরম, নিচু, জলা অঞ্চলের প্রাণী নয়?
হ্যাঁ টারজান, এর আগে আর কখনও উঁচু পার্বত্য এলাকায় তাদের উঠতে দেখিনি!
TARZAN
Trademark TARZAN Owned by Edgar Rice Burroughs, Inc. and Used by Permission.

তাহলে চলো, আরও উঁচুতে বৃষ্টির এলাকায় ওঠা যাক!
তুমি ভাবছ অত শীতে...
দেখা যাক!

খুব উঁচু জায়গায় ... ঝোড়ো আবহাওয়ায় এখন যুদ্ধ চলছে...
সর্পমানবরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তাই না?

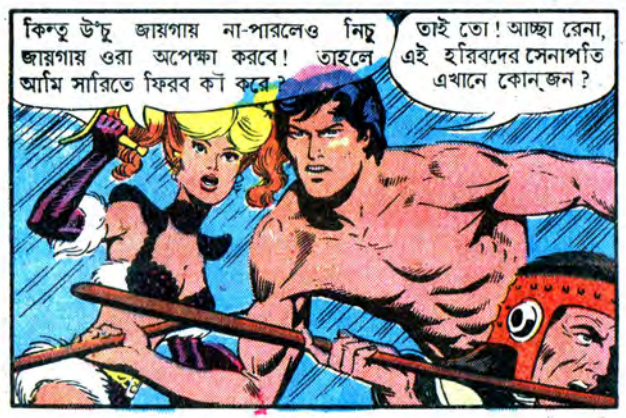
কিন্তু উঁচু জায়গায় না-পারলেও নিচু জায়গায় ওরা অপেক্ষা করবে! তাহলে আমি সারিতে ফিরব কী করে?
তাই তো! আচ্ছা রেনা, এই হরিবদের সেনাপতি এখানে কোন্‌জন?

ওই তো, মস্ত গিরগিটির উপরে ওই তো ওদের মেয়ে-সেনাপতি!
আচ্ছা, এক কাজ করো! তোমরা আরও উপরে উঠে যাও ... আমি দেখি কী ...

...করা যায়!
কী ব্যাপার?

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

শব্দ সন্ধান

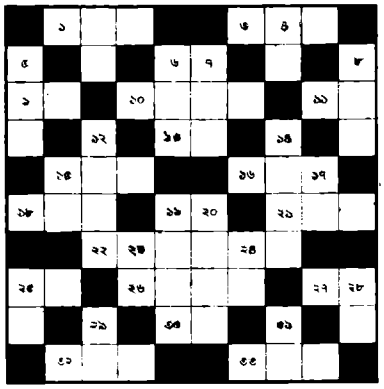

সংকেত ঃ পাশাপাশি ঃ (১) খাঁচা। (৩) যে-পাখি ছবিতে ছাড়া কেউ কখনও দেখেনি। (৬) এই খেলা কুরুক্ষেত্র ঘটিয়েছিল। (৯) পৃথিবীবিখ্যাত মসজিদ। (১০) নদীর নাম। (১১) সরাইখানা। (১৩) পায়ের গয়না। (১৫) পাখির নাম। (১৬) পাহাড়ী পথ এই রকমই হয়। (১৮) জীবাণুবিশেষ। (১৯) ছোট চিঠি বা ফর্দ। (২১) প্রাণিদেহে থাকে। (২২) ব্রহ্মার এক মানসপুত্র ঋষি। (২৫) তপস্বী। (২৬) প্রশান্ত মহাসাগরীয় একটি দেশের রাজধানী। (২৭) প্রাচীন মহাকবি। (৩০) লক্ষ্মী। (৩২) অগভীর হ্রদ, যার একদিকে থাকে সমুদ্র। (৩৩) জলচর পাখি।

উপর-নীচ ঃ (২) দুই ধরনের প্রাণী বোঝায়। (৪) ঋষি আর হরিণ কি এক? (৫) যে-হ্রদের নাম শুনলে মনে হয় এবার সন্ধে হবে। (৬) ভারতীয় বিমানবন্দর। (৭) মাটি খোঁড়ার অস্ত্র। (৮) সূর্যকান্তমণি। (১২) এই বাঙালি কবি বাঘছাল পরতেন কি? —নইলে এই নাম কেন? (১৪) এই পৌরাণিক রাজার নামেই বিষম গণ্ডগোল। (১৫) হাতির সঙ্গে এই জন্তুকে মিশিয়ে সুকুমার রায় এক আজব প্রাণীর কথা কল্পনা করেছিলেন। (১৭) বর্ণ। (১৯) উচ্চ কণ্ঠস্বর। (২০) এঁর ঝুলিতে অনেক গল্প। (২৩) উলটে নিলে প্রশ্ন। ((২৪) মানুষের সবচেয়ে আপনজন। (২৫) ভালুক। (২৮) মেঘ। (২৯) সমাসের নাম। (৩১) আমাদের প্রতিবেশী এক রাজ্যের জাতীয় উৎসব।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

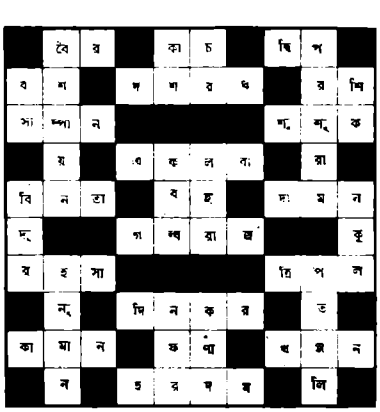

ধাঁধা

এক বাক্স দেশলাই নিয়ে ছোট্কা দেখি আপন মনে খাটের ওপর কাঠি সাজিয়ে-সাজিয়ে কী সব হিসেব করে যাচ্ছে।

সামনে একটা ইংরেজি বই খোলা। সেই বইটা একবার করে পড়ে নিচ্ছে আর পর-মুহূর্তেই কাঠি গুনে গুনে বিছানায় ফেলছে। একটু পরে ফের তুলে নিচ্ছে।

আমি যে ঘরে ঢুকেছি, ছোট্কা দেখেছে। কিন্তু এমনই মশগুল যে, মুখে কোনো কথা বলছে না। শুধু চোখের ইশারায় একবার বসতে বলল ছোট্কা।

আমি তাই চুপচাপ বসে দেখতে থাকি। ছোট্কার কাঠি সাজানোর খেলা শেষ হল। বইটা বন্ধ করে শেলফে তুলে রাখল। তার-পর বলল, "এবারের প্রথম ধাঁধা কাঠি-চালা-চালির। সেটাই তৈরি হল এতক্ষণ ধরে. বুঝলে সতুবাবু?"

ধাঁধাই যে তৈরি হচ্ছে, তা ঠিকই বুঝতে পেরেছি আমি। তাই তো এতক্ষণ চুপ করে অপেক্ষা করছিলাম। ছোট্কা ধাঁধার কথা তুলতেই তাই কাগজ-কলম খুলে বসে পড়ি। ছোট্কা বলে যেতে থাকে।

প্রথম ধাঁধা ॥ ৪৮টা দেশলাই কাঠি তিনটে ভাগে সাজানো রয়েছে। তিনটে ভাগে সমান-সংখ্যক কাঠি নেই কিন্তু। ভাগগুলো অসমান। তিনটে চালে কাঠিগুলোকে সমান সমান ভাবে ভাগ করা হবে। প্রথম চালে কী করলাম, মন দিয়ে শোনো।

দ্বিতীয় ভাগে যত কাঠি ছিল, প্রথম ভাগ থেকে ঠিক ততগুলো কাঠি নিয়ে দ্বিতীয় ভাগে যোগ করে দিলাম। এটা হল প্রথম চাল।

দ্বিতীয় চালে করলাম কী,—তৃতীয় ভাগে যত কাঠি ছিল ঠিক সেই সংখ্যক কাঠি দ্বিতীয় ভাগ থেকে তুলে নিয়ে তৃতীয় ভাগে যোগ করে দিলাম।

সব শেষ চালে, প্রথম ভাগে যতগুলো কাঠি পড়ে ছিল তার সমান-সংখ্যক কাঠি তৃতীয় ভাগ থেকে তুলে নিলাম এবং সেই কাঠিগুলো প্রথম ভাগে যোগ করে দিলাম।

এর ফলে দেখা গেল, তিন ভাগেই কাঠির সংখ্যা হল সমান সমান। কোনো ভাগে কম বা বেশি আর নেই।

এবার বলো, শুরুতে কোন্ ভাগে কত-গুলো করে কাঠি ছিল?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ এটাও ভাগাভাগির ধাঁধা।

এক বুড়ি জমিদার-বাড়িতে ডিম বিক্রি করতে গেছে। তিনটে দরজা পার হয়ে ঢুকতে হবে তাকে বাড়ির ভেতরে। প্রত্যেক দরজায় একজন করে প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথম প্রহরীকে ঘুষ দিতে হল। বুড়ির যতগুলো ডিম ছিল তার অর্ধেকটা এবং সেই সঙ্গে আরও আধখানা ডিম ঘুষ নিয়ে ছাড়ল প্রথম প্রহরী। এর পর দ্বিতীয় প্রহরীর পালা। বুড়ির বাকি ডিমের অর্ধেক আর আরও আধখানা ডিম ঘুষ নিয়ে দ্বিতীয় প্রহরী ছেড়ে দিল বুড়িকে। তৃতীয় প্রহরীও তাই করল। বুড়ির অবশিষ্ট ডিমের অর্ধেক ও আরও আধখানা ডিম নিল তৃতীয় প্রহরী। এর পর বুড়ি ভেতরে গেল। তখনও তার ঝুড়িতে তিন ডজন ডিম।

মজার ব্যাপার হল, বুড়িকে কিন্তু কোনো ডিমই ভেঙে আধখানা করতে হয়নি। হিসেব মতো সবাইকে তার প্রাপ্য ঠিক ঠিক বুঝিয়ে দিয়েছে।

বলতে পারো, কত ডিম প্রথমে ছিল তার?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ ৯০-কে এমন চার ভাগে ভাগ করতে পারো যাতে প্রথম ভাগের সঙ্গে ২ যোগ দিলে, দ্বিতীয় ভাগ থেকে ২ বিয়োগ করলে তৃতীয় ভাগকে ২ দিয়ে গুণ করলে এবং চতুর্থ ভাগকে ২ দিয়ে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে একই উত্তর হয়?

চতুর্থ ধাঁধা ঃ তিনটে ৪ দিয়ে ৪০ লিখতে পারো?

গতবারের উত্তর ॥ (১) এ-পারে রইল ক, খ, গ এবং কণা। ওপারে গেল খনা ও গোপা। একটি মেয়ে ওপারে থেকে গেল। একজন ফিরে এসে কণাকে নিয়ে চলে গেল ওপারে। এপারে তাহলে তিন বাবা, ওপারে তিন মেয়ে।

কণা ফিরে এল। কণা ও তার বাবা 'ক' রইলেন এ-পারে. খ ও গ ওপারে গেলেন।

খ ও খনা নৌকো নিয়ে ফিরে এলেন। ওপারে রইল গ ও গোপা।

এপারে রইল কণা ও খনা। ক ও খ ওপারে গেলেন। গোপা নৌকো নিয়ে এপারে ফিরে এল। তিন মেয়ে এপারে, তিন বাবা ওপারে।

খনা ও গোপা চলে গেল ওপারে। ক নৌকো নিয়ে এপারে এলেন। ওপারে তাহলে খ ও খনা, গ ও গোপা। এপারে ছিল কণা। ক এলেন মেয়েকে নিতে।

ক ও কণা নৌকো নিয়ে ওপারে গেলেন। (২) বড় তরমুজের আয়তন ছোটটার থেকে ১½×১½×১½=১২৫/১৬ গুণ বড়, অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ। দাম অথচ দেড় গুণ বেশি। বড়টা কেনাটাই তাই লাভজনক। (৩) ১৩। ১৩র বর্গ ১৬৯। উল্টে নিলে ১৬১। এর বর্গমূল ৩১। (৪) ৬৬৬৭।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

সমাধান আগামী সংখ্যায় ফোটো তপন দাশ

গত সংখ্যায় ছিল চাবির খাঁজের ছবি

উত্তর বটে

প্রঃ বহুব্রীহি সমাসের একটি উদাহরণ ; 'চারি মাথা মিলিত যেখানে' এক কথায় কী ?

উঃ গণ্ডগোল।

প্রঃ 'ভাল ছেলে' এই বিধেয় অংশটিতে একটি উদ্দেশ্য জুড়ে দাও।

উঃ নিশ্চয় কোনো কাজ চাপাবার মতলব আছে।

প্রঃ মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসের একটি উদাহরণ দাও।

উঃ 'ফরাক্কা', মধ্যপদ লোপ করলে ফক্কা।

প্রঃ 'পদ' কাকে বলে ?

উঃ বড়দের পা-কে।

প্রঃ কোন শব্দ বুড়োদের বেলায় প্রশংসা কিন্তু ছোটদের বেলায় নিন্দে বোঝায় ?

উঃ পাকা, যেমন পাকা মাথা, আর অতি পাকা ছেলে।

প্রঃ অব্যয় কাকে বলে ? উদাহরণ দিয়ে লেখো।

উঃ যা কিছুতেই ব্যয় হয় না; যেমন মাস্টারমশাইর হাতে পরীক্ষার নম্বর।

প্রঃ সর্বনামের একটি উদাহরণ দাও।

উঃ থিরুমঙ্গলাকুডি রামচন্দ্র পঞ্চাপা কেশন, এতে গ্রামের নাম, বাবার নাম, নিজের নাম ও পদবী সবরকম নামই আছে।

সুসেন

মজার খেলা

এই খেলাটা দেখাবার জন্য দরকার মাত্র ১২টি দেশলাইকাঠি। ব্যস, আর কিছু না।

বারটি দেশলাইকাঠি দিয়ে নীচের ছবির মতো করে চারটি বর্গ দিয়ে তৈরি বড় বর্গ সাজিয়ে ফেলো।

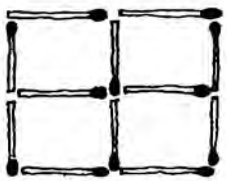

এবার কোনো বন্ধুকে ডেকে বলো, তিনটে কাঠিকে সরিয়ে এমনভাবে এদিক-ওদিক সাজাতে হবে যে, তিনটে বর্গ মাত্র পড়ে থাকবে। কাঠি তুলে হাতে রেখে দিলে হবে না। শুধু এদিক-ওদিক করে সাজাতে হবে মাত্র। যদি উত্তর জানা না থাকে, বহু সময় লেগে যাবে বন্ধুদের। কিন্তু উত্তর যদি জানা থাকে তাহলে এক মিনিটও লাগবে না।

বন্ধুদের দেখাবার আগে নিজেই একবার চেষ্টা করে দেখো না। কী, পারছ না তো? বেশ, তাহলে এসো, নিজেই সাজিয়ে ফেলা যাক।

নীচের ছবিতে দেখো, কোন্ তিনটে কাঠি সরাতে হবে।

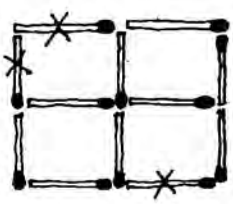

যে-কাঠিগুলো সরানো হবে, সেই তিনটিতে × চিহ্ন দেওয়া হল। এবার নীচের ছবির মতো করে সাজিয়ে ফেলো। তাহলেই তিনটে বর্গ তৈরি হয়ে যাবে। × চিহ্নিত কাঠিগুলো কীভাবে বসছে দেখে নাও।

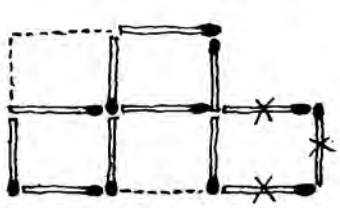

মজারু

আটখানা

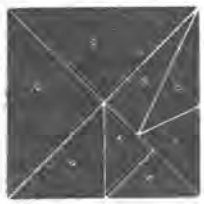

নতুন বছর শুরু হল। তোমরা সবাই নতুন ক্লাসে উঠেছ। বাড়িতে এসেছে শীতের ঝলমলে নতুন পোশাক। চতুর্দিকে নতুনের ছড়াছড়ি। কী আনন্দ। ঠিক তোমাদের মতোই আনন্দে কিচ কিচ শুরু করে দিয়েছে একটা একরত্তি ফুটফুটে পাখির বাচ্চা। সবে পাখা মেলতে শিখেছে। কিন্তু এখনও উড়তে শেখেনি। এই সুন্দর বাচ্চাটাকে ধরে তোমাদের নিশ্চয়ই খুব আদর করতে ইচ্ছে করছে। এবারের আটখানা দিয়ে ওকে পাঠিয়ে দিলাম তোমাদের কাছে, দ্যাখো তো ভাব জমাতে পারো কি না।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

অসিত পাল

মিঃ ক্যালকুলাস, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না...

আর হ্যাঁ, একটা পরামর্শ দিচ্ছি, কেউ জানতে না পারে!

কী, বুঝলেন তো? আচ্ছা চলি!

ক্যাপ্টেন, কাজ শেষ, আমরা চলি। শুধু মনে রেখো, আমরা ছিলুম বলেই ম্যাক্স বার্ড তোমাদের উপরে হামলা করতে সাহস পায়নি।

তাহলে তোমরা বাড়ি যাচ্ছ?

না, ঠিক তা নয়, পাম্প করতে-করতে হয়রান হয়ে গিয়েছিলুম তো, তাই গ্রামের দিকে আমাদের এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে দিনকয়েক একেবারে হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নেব।

বাঃ, সে তো ভালই!

যাক বাবা, আর পাম্প চালাতে হবে না!

উঃ, আর না!

ছোলা ভাঙা শেষ করো, তারপর বিচালি কাটতে হবে!

দিন কয়েক বাদে...

সুপ্রভাত, টিনটিন!

আরে, প্রোফেসর যে! কী খবর?

ও, তাই বুঝি? তা আমি সেই দলিলগুলো নিয়ে এসেছি।

দলিল? কিসের দলিল?

আরে না, আমি বলছি দলিলের কথা! সমুদ্রের তলায় পাওয়া বাক্সের মধ্যে যা পেয়েছিলে, সেই ছেঁড়া দলিল। আমি সেগুলো জোড়া লাগিয়েছি। এই দ্যাখো!

ক্যাপ্টেন বোধহয় এটা দেখলে খুশিই হবে, কী বলো?

আরে! আশ্চর্য! অদ্ভুত!

শিগগির চলুন ক্যাপ্টেনের কাছে!

স্যার ফ্রান্সিস হ্যাডককে পুরস্কার দিতে মনস্থ করিয়া ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় চার্লস...
আরেব্বাস রে!

পড়ো, পড়ো, সবটা পড়ো...

স্যার ফ্রান্সিস হ্যাডককে পুরস্কার দিতে মনস্থ করিয়া ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় চার্লস.....

আরেব্বাস! এ যে মার্লিনস্পাইক হল! আমাদের পারিবারিক বাড়ি! আশ্চর্য! অদ্ভুত!

কিন্তু সবটা তো তোমরা জানো না! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি!

এই নাও দ্যাখো!

এখন তাহলে কী করা?

জেমস্ বিডাপ অ্যাণ্ড কোং

নিলাম! নিলাম!
শনিবার
৯ আগাস্ট

মার্লিনস্পাইক হল আগামী ৯ আগস্ট নিলামে বিক্রয় হইবে। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিরা অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।

বাঃ, এ তো সোজা ব্যাপার! তোমাদের পারিবারিক বাড়ি যখন বিক্রি হতে চলেছে, তখন তোমাকেই সেটা কিনতে হবে!

কিনব? টাকা কোথায়?

তাই তো, কিছু টাকা তো দরকার!

উঃ, সেই গুপ্তধন যদি পাওয়া যেত!

কাগজটা দেখব?

হ্যাঁ!

!

ক্যাপ্টেন, মার্লিনস্পাইক হল নিলামে বিক্রি হচ্ছে। আমরা কিনে নেব।

তাই বুঝি?

কিনব তো, কিন্তু টাকা কোথায়? কোথায় পাব টাকা?

টাকা? কত টাকা চাই?

(এরপর চৌত্রিশের পাতায়)

অক্ষরে অক্ষরে

অনিরুদ্ধ কর

মিণ্টুদি প্রথম যখন দুদুনকে নিয়ে আমাদের বাড়ি এলেন, দুদুন তখন এই এতটুকু। হালকা গোলাপি রঙের তোয়ালেতে মোড়া ফুটফুটে একটা বাচ্চা। কী ছোট ছোট সরু সরু আঙুল, যেন কুমোরপাড়ায় অর্ডার দিয়ে তৈরি করা। পিটপিট করে তাকাত দুদুন আর ফিকফিক করে হাসত। শান্তাদি ওকে কোলে নিয়ে আদর করার সময় দুদুন শান্তাদির কাপড় ভিজিয়ে দিল। তারপরই দুদুন বদলি হল মলিদির কোলে। তার পরপর খুকুদি আর লিলিদির কোলে। কিন্তু যতক্ষণ কোল-বদল চলছিল, ততক্ষণ মিণ্টুদি সমানে রানিং কমেণ্টারি দেবার মতো বলে চলছিলেন, দুদুনের বিচিত্র ভাষা আর হাত-পা নাড়ার অর্থ কী।

"এই যে এখন হাসছে, এর মানে শান্তার কোল ভিজিয়ে দিয়ে দুষ্টুমি করে ওর ভারি মজা লেগেছে।" মিণ্টুদি বললেন।

পরমুহূর্তে বললেন, "এই দ্যাখ দ্যাখ, মলির চোখের দিকে কেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে মানে, বুঝলি, ভাবছে ওর সঙ্গে নতুন কী দুষ্টুমি করা যায়। কী বুদ্ধি দ্যাখ।"

এই হল আমাদের মিণ্টুদি।

দুদুন বড় হতে থাকল।

মিণ্টুদি দু-মাস আড়াই মাস অন্তর-অন্তর আমাদের বাড়ি আসতেন। আমাদের মাসতুতো বোন তার ওপর শান্তাদির প্রাণের বন্ধু।

আর মিণ্টুদি এলেই আমরা শুনতে পেতাম দুদুনের নতুন-নতুন সব কীর্তি-কাহিনী।

এই অ্যাত্তটুকু একটা পুঁচকে বাচ্চা যে কেমন চিন্তা-ভাবনা করতে পারে, যা ভাবছে তা আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতে পারে, সে-সব জেনে আমরা অবাক হয়ে যেতাম।

আমাদের ঠাকুমার নাম আশ্চর্যময়ী। তিনি পর্যন্ত দুদুনের কাজকর্মে আশ্চর্য হয়ে গিয়ে বলেছিলেন, "এত তো বয়েস হল, কিন্তু এমনটি আর দেখিনি। ঘরেরটা পাললাম, পরেরটা পাললাম, তবু এই ছেলেটা আমায় তাক্ লাগিয়ে দিল।"

আশ্চর্যময়ীর, মানে ঠাকুমার, আশ্চর্য হবার অর্থ অনেক। ঠাকুমার অনেক বয়স হয়েছে। এতদিন, এত বছর, বেঁচে থেকেও ঠাকুমা যদি দুদুনের মতো বুদ্ধিমান বাচ্চা আর দেখেননি বলেন, তখন ধরে নিতেই হবে যে, দুদুন সত্যি-সত্যি একটু বেশিই বুদ্ধিশুদ্ধি রাখে।

মিণ্টুদির মুখখানা তখন খুশিতে ভরপুর। তা হবেই। কারণ, তিনিই তো প্রথম আবিষ্কার করেছেন যে, দুদুন আর-সকলের চেয়ে আলাদা এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান।

যাই হোক, এ-ভাবে দিন কাটতে লাগল। দুদুন তার বুদ্ধি

ও প্রতিভার পরিচয় দিয়ে সবাইকে অবাক করে দিতে লাগল। তবে মিণ্টুদিকে এখন থেকে একটু বেশি খাটতে হত। কেননা, দুদুন যদি আপন খেয়ালে একটা হাত তুলত, মিণ্টুদিকে তখন বুঝিয়ে দিতে হত যে, আধঘণ্টা আগে দুদুন হাত তুলে যদি দেয়ালের টিকটিকি দেখিয়ে থাকে, তবে এখন ওর হাত তোলার অর্থ হচ্ছে ছোটকাকার অফিস যাবার সময় তাকে বিদায় জানানো।

এক কথায়, মিণ্টুদি ছিলেন অনেকটা দুদুনের দোভাষীর মতো। দোভাষীরা যেমন অচেনা বিদেশী ভাষায় কথা বললে তার মানে আমাদের ভাষায় অনুবাদ করে বুঝিয়ে দেয়, মিণ্টুদিও তেমনি দুদুনের বিচিত্র ভাষার অর্থ আমাদের সযত্নে বুঝিয়ে দিতেন। অনর্গল বুঝিয়ে যেতেন।

এতে আমাদের সুবিধাই হত।

কারণ, তা না হলে আমরা বুঝতেই পারতাম না যে, আকাশে চাঁদ দেখে দুদুন প্রথমে তাকে সাধারণ বাচ্চাদের মত টিপ পরার কথা বলে, তারপর পা তুলে চাঁদটাকে বল ভেবে শট্ মারার কথা বলছে। মিণ্টুদির রানিং কমেণ্টারির জন্যই সেটা সম্ভব হত।

দেখতে-দেখতে দুদুনের ন-মাস বয়েস হল। দুদুন এখন ধরে-ধরে হাঁটতে পারে। মিণ্টুদির খাটুনি আরও বেড়ে গেল।

কী ভেবে দুদুন হাঁটছে, হাঁটতে হাঁটতে কী ভাবছে, কেন এদিকে হেঁটে না গিয়ে ওদিকে হেঁটে গেল, তার অর্থ মিণ্টুদি বুঝিয়ে দিতেন।

সত্যি বলতে কী, এমন অর্থপূর্ণ শিশু আমরা আর দেখিনি। আশ্চর্যময়ী ঠাকুমা কি আর সাধে আশ্চর্য হয়েছিলেন।

ছোটকাকা যে ছোটকাকা অফিস থেকে ফিরে কেবল ছোট্ট ট্রানজিস্টর রেডিও শুনে সময় কাটান, তিনি পর্যন্ত রেডিও বন্ধ রেখে মিণ্টুদির ধারাবিবরণী শোনেন। সঙ্গে অবশ্যই দুদুনের চলাফেরা আর আধো-আধো কথাবার্তা থাকে।

এটা আরেকটা অবাক কাণ্ড! কারণ ছোটকাকে আমরা রেডিও ছাড়া বড়-একটা দেখিনি কখনো। ওই ছোট ট্রানজিস্টর রেডিওটা যেন ছোটকার প্রাণের জিনিস। সেই ছোটকা এখন রেডিওতে ন্যাশনাল ফুটবলের রানিং কমেণ্টারি না-শুনে দুদুনকে দেখেন এবং মিণ্টুদির রানিং কমেণ্টারি শোনেন।

মিণ্টুদি দুদুনের কোষ্ঠী তৈরি করতে দিয়েছিলেন। বড় জ্যোতিষী এবং ভারী ব্যস্ত। তাই সময় লাগবে। তবে প্রাথমিক মন্তব্য হিসেবে জ্যোতিষীঠাকুর একটা সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, দেড় থেকে দু-বছর বয়েসের মধ্যে দুদুনের একটা মুশকিল আসছে, তবে ও নিজের বুদ্ধিমত্তায় সেই মুশকিলটা কাটিয়ে উঠবে।

অনেক গুনে-গেঁথে জ্যোতিষীঠাকুর দু-মাসে দুদুনের দেড়-দুই বছরের জীবন পর্যন্ত এগিয়েছেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে সতর্ক করেও দিয়েছেন।

মিণ্টুদি যখন এসে খবরটা ঘোষণা করলেন, তখন সারা বাড়িতে বেশ একটা দুশ্চিন্তা দেখা গেল।

ঠাকুমা একটা রক্ষাকবচ মানে মাদুলি নেবার প্রেসক্রিপশন করলেন। ছোটকা রেডিও বন্ধ করে গম্ভীর মুখে বললেন, "অতীন যেন মাস ছয়েকের ছুটি নিয়ে ওই সময়টা বাড়িতে থাকে এবং দুদুনের ওপর কড়া নজর রাখে।" অতীন আমাদের জামাইবাবুর নাম, মানে দুদুনের বাবার নাম। ছোটকার মতে দুদুনের দেড় থেকে দু-বছর এই ছ-মাস ছুটি নিয়ে অতীনদা যদি বাড়ি থাকেন এবং দুদুনের দিকে নজর রাখেন, তবে মিণ্টুদি আর অতীনদার চোখে-চোখে থাকলে দুদুন সেই মুশকিলটা সহজেই এড়াতে পারবে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য একজন স্পেশাল লোক রাখা ঠিক হল, যে সর্বক্ষণ দুদুনকে পাহারা দেবে।

সৌভাগ্যক্রমে, এ-রকম নজরদারির জন্যই হোক আর অন্য যে-কোন কারণেই হোক, তেমন কিছু মুশকিল ঘটল না। দুদুনের প্রায় দু-বছর পুরে এল।

সেদিন মিণ্টুদি এলেন দুদুনের জন্মদিনের নেমন্তন্ন করার জন্য। বাড়িসুদ্ধু সকলের নেমন্তন্ন। মিণ্টুদি সবাইকে যেতে বললেন। সঙ্গে গুটগুট করে দুদুন হাঁটছে। মিণ্টুদির বলা শেষ হলেই ও বলছে, "দেও।" মিণ্টুদি অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিলেন, "ও বলছে 'যেও'—মানে তোদের নেমন্তন্নে যেতে বলছে রে।"

মিণ্টুদির তাড়াতাড়ি ছিল, তবু দুদুনের নতুন একটা খেলা না দেখিয়ে যেতে পারলেন না। বললেন, "জানিস এবার না ওর নতুন একটা খেলা হয়েছে। রেডিও চালালেই তা শুনে ঠিক সেইরকম গলায় কথা বলবে।"

ব্যাপারটা শুনেই এমন মজার বলে মনে হল যে, আমরা দেখতে চাইলাম খেলাটা।

জলচৌকির ওপর ছোটকা তাঁর ট্রানজিস্টর রেডিও রেখে চালিয়ে দিলেন। বিশেষ কী একটা ব্যাপার ছিল। দেশাত্মবোধক গান বাজছিল।

দুদুনকে মিণ্টুদি বললেন, "গান কী বলছে বাবা?"

রেডিওতে তখন 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষ' গান হচ্ছে। কিন্তু কী আশ্চর্য! ভারতবর্ষ উঠলে কী হবে, দুদুন উঠল না; নড়ল না পর্যন্ত। মুখের মধ্যে আঙুল পুরে রেডিওটা দেখতে লাগল। অন্যসময় হলে মিণ্টুদি নির্ঘাত ওই মুখে-আঙুল-পুরে-তাকিয়ে-থাকার একটা ব্যাখ্যা দিতেন। কিন্তু আজ খেলার কথা আগেভাগে ঘোষণা করে ফেলায় সেটা আর সম্ভব ছিল না মিণ্টুদির পক্ষে।

এরপর একে একে 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি' আর 'হিন্দুস্থান হামারা' হয়ে গেল, কিন্তু দুদুন অচল অটল নির্বিকার ভাবে বসে রইল। মিণ্টুদির কাশীর পাকা পেয়ারার মত ফরসা মুখ প্রথমে গোলাপি, তারপর একটু লাল, আর তারও পরে 'হিন্দুস্থান হামারা' গানের শেষে টকটকে লাল হয়ে উঠল। চোখে প্রায় জল এসে যায় আর কী। দুদুনকে অব্যাহতি দেবার জন্য ছোটকা কিছু একটা বলতে যাবেন, এমন সময় 'কারার ওই লৌহকপাট ভেঙে ফ্যাল, কর রে লোপাট' গানের শব্দে তাঁর কথা চাপা পড়ে গেল।

হঠাৎ দেখলাম দুদুন যেন একটু নড়ে বসছে। তারপর মুখ থেকে আঙুল সরাল। মিণ্টুদির মুখে চকিতে হাসি দেখা দিল। দুদুন আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে, রেডিওর কাছে গেল। মন দিয়ে গানটা শুনতে লাগল। কী একটা যান্ত্রিক গোলযোগে, হয়ত ভাঙা রেকর্ডের জন্যই, গানটার একটা জায়গাই তখন বার-বার হচ্ছে। দুদুন তখনও রেডিওর কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে। রেডিওতে ক্রমাগত বাজছে 'ভেঙে ফ্যাল্... ভেঙে ফ্যাল... ভেঙে ফ্যাল'। কী যে বিচ্ছিরি! পরের লাইনটা শুনলে দুদুন নিশ্চয় ওর খেলাটা দেখাত।

হঠাৎ কারও কিছু বুঝবার আগেই দুদুন দু-হাত দিয়ে রেডিওটা তুলে ছুঁড়ে দিল সিঁড়ির গোড়ায়। সঙ্গে-সঙ্গে রেডিওটা সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে একেবারে একতলায় গিয়ে থামল। ততক্ষণে পরের লাইন শুরু হয়েছে।

ছোটকাকার মুখ এবার শুকিয়ে গেছে।

মিণ্টুদির মুখে লজ্জা ছিল, কিন্তু জয়ের আনন্দে লজ্জা তখন ঢাকা পড়েছে। শুধু বললেন, "এমন একটা 'ভেঙে ফ্যাল' জায়গায় গানটা আটকে গেল যে, রেডিওটা বুঝি সত্যিই ভাঙল। জ্যোতিষী কিন্তু ঠিকই বলেছিল রে। ওর দু-বছর পুরতে আর মাত্র ছ-দিন বাকি।"

ছবি বিমল দাশ

আমার কিছু টাকা আছে।

সে তো খুবই ভাল কথা। কিন্তু আমার যে টাকা নেই।

সাবমেরিনের পেটেন্ট বিক্রি করে সরকারের কাছ থেকে কিছু টাকা পেয়েছি। চলো, সেই টাকা দিয়েই বাড়িটা আমরা কিনে নেব।

এই বাড়ি বিক্রয় করা হইবে

এই বাড়ি বিক্রয় করা হইবে

যাক, গুপ্তধন না-ই মিলুক, তোমার পূর্বপুরুষের বাড়িটা তুমি ফিরে পেয়েছ, এই বা মন্দ কী!

দারুণ বাড়ি!

এখনও তো সবটা দ্যাখোনি!

এই ঘর থেকে তোমাকে টেলিফোন করেছিলুম!

তাই নাকি?

শ্‌শ্‌শ্‌

মনে হল কার যেন পায়ের শব্দ?

বটে?

বাড়িটা তো ভালই! কিন্তু মদের কুঠুরিটা কোথায়?

এই তো, এদিকে.....

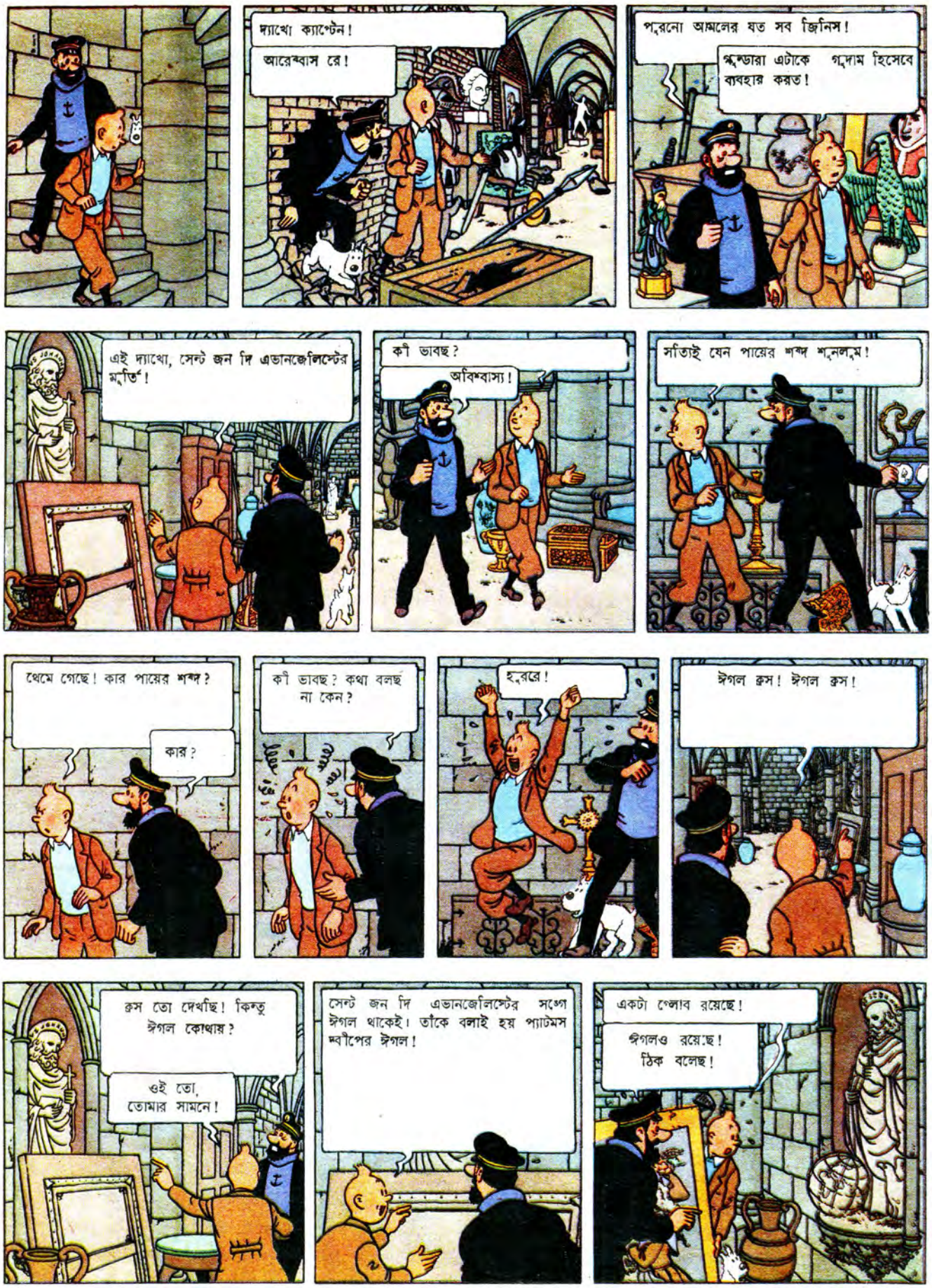

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

বিশ্বকাপ ফুটবল / সচিত্র ধারাবিবরণী

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

উপন্যাস

বনবিবির বনে

বুদ্ধদেব গুহ

আগে যা ঘটেছে

আমি ঋজুদার সঙ্গী হয়ে সুন্দরবনে বাঘ শিকারে এসেছি। শীতকাল, কিন্তু বৃষ্টি নেমেছে আকাশ ভেঙে। ট্রানজিস্টরে বলেছে যে, বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ার ফলে আবহাওয়া তিনদিন খুব দুর্যোগপূর্ণ থাকবে। সঁুতিখালের মধ্যে নোঙর-করা মোটর বোটে একদিন এক রাত কাটার পরে আমি ঋজুদাকে ধরলাম, "গল্প বলো।" ঋজুদা শুরু করল তার জেঠুমণির শিকার-কাহিনী। দারুণ সব মজার-মজার গল্প—

২

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঋজুদা বলল, "একটু যেতে-না যেতেই যুগলের স্পটলাইটের আলোয় ডানদিকে জঙ্গলের ফাঁকে-ফাঁকে শ'খানেক গজ দূরে খাড়া পাহাড়ের গায়ে নীলচে-লাল কী যেন চোখ জ্বলে উঠল।

"যুগল কী জানোয়ার তা নিরীক্ষণ করে বলবার আগেই জেঠুমণি গুলি চালিয়ে দিলেন। চোখটা জ্বলতেই লাগল। আবার গুলি চলল। আণ্ডার লিভারের ঘ্যাটা-ঘং আওয়াজ হচ্ছিল প্রত্যেকবার রিলোডিং-এর সময়।

"দাশকাকু বললেন, 'ওরে, বাঘ যে ঘাড়ে চলে আসবে, স্টপ ইট্, স্টপ দিস চাইল্ডিশ ফায়ারওয়ার্ক। বাড়ি চল, প্লিজ বাড়ি চল।'

"জেঠুমণির ম্যাগাজিন যখন শেষ হয়ে গেল তখন গুলি আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল।

"যুগল হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

"রণক্ষেত্র শান্ত হলে অবাক গলায় সে জেঠুমণিকে শুধোলো. 'কওন চি বা সাহাব?'

"জেঠুমণি চটে উঠে বললেন. 'ম্যায় কা জানতা? তুম বান্তি ফেকা থা। ম্যায় উসি লিয়ে গোলি চালায়া।'

"যুগল বলল, 'ও তো মাইকা অভ্র। চারদিকে অভ্রখনি। এখানে সব নানারকম পাথরের ভাঁজে ভাঁজে মাইকা থাকে। মাইকা জ্বলে ওঠে, আলো পড়লেই।'

"জেঠুমণি বললেন, 'ই-শ-শ, এতগুলো গুলি!'

"দাশকাকু বললেন, 'তাই-ই ভাবছিলাম। বাঘ হলে কি আর অ্যাটাক করত না এতক্ষণে?'

"মাহমুদ বলল, 'এক এক গোলিকা কিম্মৎ কিতনা সাহাব?'

"জেঠুমণি বললেন, 'দশ টাকা।'

"তাড়াতাড়ি হিসাব করে মাহমুদ হোসেন বলল, 'ইয়া আল্লা, কিতনা আচ্ছা খাসসি মিল যাতা থা একঠো, ইতনা রুপেয়াসে।'

"মাহমুদ হোসেনকে জীপ এগোতেই দাশকাকু বললেন. আরও যাবি? শিকার তো হলই। আর কেন?'

"জেঠুমণি বললেন, 'সবে তো সন্ধে। এর মধ্যে ফিরে গিয়ে কী করবি বাংলোতে?'

"মিনিট পনেরো জীপ চলল, মাঝে মাঝে নইট-জার পাখিগুলো লাল লাল গোল চোখ আর বাদামী-ছাই শরীর নিয়ে একেবারে জীপের বনেট ফুঁড়ে ফুঁড়ে উড়ছিল।"

ঋজুদা গল্প থামিয়ে আমাকে বলল, "পাখিগুলো তুই তো দেখেইছিস নিশ্চয়ই। জঙ্গলের পথের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকে—জীপটা যখন প্রায় তাদের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে হঠাৎ সোজা মাটি থেকে ফর ফর করে উড়ে ওঠে।

"দাশকাকু বললেন, 'এ কী অলক্ষুনে পাখি রে বাবা।'

"অলক্ষুনে কেন? জেঠুমণি বাঁদুরে টুপি-পরা মাথা ঘুরিয়ে দাশকাকুকে শুধোলেন।

"ঠিক এমন সময়—হিস্স্-স্-স্-স্ করে যুগলের শিস শোনা গেল। আমরা সকলে একসঙ্গে আলোর দিকে তাকালাম। এই-খানে রাস্তাটার দু পাশে উঁচু পাথুরে জমি দু মানুষ সমান প্রায়। বাঁ দিকে সেই জমির ঠিক উপরে একজোড়া লাল চোখ জ্বলছে। দুটি চোখের মধ্যের দূরত্ব সামান্যই। কিন্তু লাল।

"আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'রিয়্যাল বাঘ।'

"আর যায় কোথায়?

"জেঠুমণি রাইফেল তুলেছিলেন, দাশকাকু নিজের বন্দুকটা আমার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে অতর্কিতে পেছনের সীট থেকে জেঠুমণির উপর বডি-থ্রো মারলেন এবং বডি-থ্রো মেরেই দুহাতে রাইফেল-সমেত জেঠুমণিকে জাপটে ধরলেন। একে মোটা-সোটা জেঠুমণি মোটা ওভারকোট ও বাঁদুরে টুপিতে এমনিই আড়ষ্ট হয়ে ছিলেন, তার উপর এমন চোরা আক্রমণ।

"যুগল নির্নিমেষ মনে ঐ চোখের দিকে চেয়ে ছিল। ড্রাইভারও। তারা দুজনেই জীপের মধ্যের হঠাৎ অনির্ধারিত আলোড়নে কোনো জানোয়ার পেছন থেকে উঠে পড়ল ভেবে চমকে উঠল।

"জেঠুমণি কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ততক্ষণে নিশ্ছিদ্র আবৃত শরীরের উপরে দাশকাকুর শরীর, মুখ ভর্তি পান জরদা—কী বললেন শোনা গেল না—শুধু একটা ওঁ ওঁ ও° আওয়াজ শোনা গেল।

"দাশকাকু ক্রমান্বয়ে বলে চলেছিলেন, 'সবে বিয়ে করেছি. এক বছরের ছেলে, বৌকে আমার বিধবা করিস না, ওরে—রিয়্যাল বাঘ! রিয়্যাল বাঘ!'

"জেঠুমণি রিয়্যাল বাঘকে গুলি করবেন না এমন ভরসা যখন ও° আঁ ইত্যাদি সাংকেতিক প্রক্রিয়ায় দাশকাকু পেলেন ও'র কাছ থেকে, তখন উনি জেঠুমণিকে ছেড়ে দিলেন।

"জেঠুমণি ছাড়া পেয়ে. পানের ঢোক গিলে যুগলকে শুধোলেন, 'কওন চি? যুগল!'

"যুগল নৈর্ব্যক্তিক অথচ বিদ্রুপাত্মক গলায় বলল, 'দেখিয়ে না। আভভিতক্ তো খাড়া হ্যায়।'

"দাশকাকু চোখ বন্ধ করে বললেন, 'গাড়ি ঘুমাও ড্রাইভার।'

"এমন সময় রিয়্যাল বাঘ উপর থেকে আমাদের উপরেই প্রায় জাম্প্ মারল।

"দাশকাকু দু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন।

"বন-বিড়ালটা ধুলো আর পাথরে ভরা অসমান রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে একবার এই ভীরু-ভরা জীপগাড়ির দিকে তাকিয়ে দৌড়ে ডানদিকের জঙ্গলে চলে গেল।

"দাশকাকু ভীষণ লজ্জিত হয়ে পড়ে কী বলবেন ভেবে না পেয়ে বললেন, 'ওয়েল. ইট কুড্ বী আ রিয়্যাল টাইগার। ইট কুড্ ইজিলি বী!'"

গদাধর চা এনে দিল. সঙ্গে পাঁপড় ভাজা। ঠিক সেই সময় ছোটবালির গভীর থেকে রিয়্যাল রয়েল বেঙ্গল টাইগার ডেকে উঠল হা-হুম্ করে। সুন্দরবনে নদী-নালা-ভরা বর্ষণসিক্ত

ফরেস্টের মধ্যে যে বাঘের ডাক শোনেনি, জীবনে একটা পরম অভিজ্ঞতা থেকে তাকে বঞ্চিত থাকতে হয়েছে।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শিল্পীরা বলেন, নাভি থেকে যে স্বর ওঠে তা হল নাদ। ব্যাঘ্র নিনাদ যে কী পরম শরীর মন ভরে দেওয়া আনন্দ, ভয় ও বিস্ময়ে পরিপ্লুত করা শব্দ, তা লিখে বলার নয়।

বাইরে সন্ধে হয়ে আসছিল। বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়ারও বিরাম নেই। আমরা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলাম। বাঘের ডাক আমাদের উদাস, বিষণ্ণ এবং আমাদের তাৎক্ষণিক পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়েছিল।

গদাধর এসে একটা লণ্ঠন দিয়ে গেল।

ঋজুদা বলল, "এখানে না। চোখে লাগে। সামনের ডেকে রাখ।"

গদাধর বলল, "বাবু, মামা যে বড় ডাকাডাকি করে। আজ একটু রাতে নামলি হত না? মামাকি যদি পাওয়া যায়?"

ঋজুদা বলল, "দুর্যোগ না কমলে নামা ঠিক হবে না গদাধর। এইরকম আবহাওয়ায় মাংসাশী জানোয়ারদের খুব সুবিধে। অন্য জানোয়ারদের সজাগ কান এই হাওয়া আর বৃষ্টির শব্দে কাজে লাগে না—আর এই-ই সুবিধে হিংস্র জানোয়ারের। জঙ্গলে তো আর খালি চোখ দিয়ে কোনো কাজ হয় না—কান সেখানে মস্ত বড় জিনিস। এই আবহাওয়ায় নেমে খামোখা বাঘের মুখের খিচুড়ি হয়ে লাভ নেই।"

অরপর একটু চুপ করে থেকে বলল, "এই মামাকেই দেখব আমি, ভয় নেই তোর গদাধর। তোর বাবার খুনের বদলা নেব। আমি এখানে খিচুড়ি খেয়ে মজা করতে আসিনি।"

গদাধর মুখ নিচু করে বলল, "সেই কথাই বাবু।"

আমরা যখন এখানে এসে পৌঁছই তার পরদিন সকালে খাল-পাড়ে নীলমণি একটা ঝামটি দেখিয়েছিল। ঝামটি মানে, গাছের ডালের মাথায় এক ফালি ন্যাকড়া বেঁধে কাদাতে পুঁতে দেওয়া থাকে। সুন্দরবনের গভীরে প্রতি বছর এমন অনেক দেখা যায়। যেখানে বাঘে মানুষ নেয়, সেখানে ঝামটি পুঁতে বাউলে মউলে জেলেরা সাবধান করে দেয় অন্যদের। নিষেধ করে সেখানে নোঙর করতে। কিন্তু যে যেখানেই নোঙর ফেলুক, সুন্দরবনে এসে বাঘের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে চলা মুশকিল। তবুও পেঁতে ওরা। সংস্কার, অভ্যেস।

গত বছর চৈত্র মাসে গদাধরের বাবা যখন মিঠে পানি নেওয়ার জন্যে এই ছোট বালিতে নেমেছিল আরও চার-পাঁচজনের সঙ্গে, বাঘ তখন তাকে তুলে নেয়। মধু-পাড়া মউলেদের দলে ছিল গদাধরের বাবা।

গদাধর ঋজুদার কলকাতার খাস অনুচর। সুন্দরবনের গোসাবারও ভিতরে এক গ্রামে ওর বাড়ি। ঋজুদা বছরে ন' মাস প্রায় জঙ্গলে-জঙ্গলেই কাটায়—সারা বছর কলকাতায় ঋজুদার বিশপ লেফ্রয় রোডের ফ্ল্যাট আগলায় গদাধর। বড় বিশ্বাসী আর ভাল লোক।

এবারে ঋজুদার সুন্দরবনে আসার উদ্দেশ্যই ছিল গদাধরের বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া। এখানে আসার আগে ঋজুদা আমাকে বলেছিল, "বাঘ মারিনি বহু বছর। ইচ্ছে করে না অমন সুন্দর পুরুষালী জানোয়ারকে মারতে। কিন্তু গদাধরের ইচ্ছে। এটা একটা ব্যক্তিগত প্রতিশোধের ব্যাপার। সারা বছর জঙ্গলে থাকি। আজকে বহু বছর হয়ে গেল। আর আমারই যে আশ্রিত তার বাবাকে বাঘে নেবে এটা সহ্য করা ঠিক নয়। গদাধরের কাছে ছোট হয়ে যাব ঐ বাঘটা মারতে না পারলে। মারতেই হবে। যে করেই হোক।"

চা পাঁপড়-ভাজা খেতে খেতে আমি বললাম, "বলো, থামলে কেন?"

ঋজুদা বলল, "পাঁপড় ভাজা মুখে নিয়ে কেউ গল্প বলতে পারে? দাঁড়া একটু।"

হঠাৎ ঋজুদা বলল, "এখান থেকে ফিরে গিয়ে কাজি-রাঙ্গায় যাব একবার।"

"কেন?" আমি সোৎসাহে জিজ্ঞেস করলাম।

"ওখানে একটা গন্ডার মেরেছে চোরা-শিকারিরা। চোরা-শিকারিরা আর্মড। বিরাট ডাকাতের দলের মতো অর্গানাইজেশন ওদের। অন্যান্য জানোয়ারও পোচিং করে। পুলিসের ডিটেক-টিভ্‌রা জঙ্গলের এই সশস্ত্র শিকারিদের বাগে আনতে পারছে না। চোরা-শিকারি ধরা অন্য শিকারির পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ। ওখানকার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট একবার যেতে বলেছেন। অফিসিয়াল অ্যাসাইনমেন্ট্। খুব অ্যাডভেঞ্চারাস, কী বল? কারণ ওরা এর আগেও ফরেস্ট গার্ডদের মেরেছে—তাই আমাকে মারা তো খুবই সোজা। খুব থ্রিলিং হবে ব্যাপারটা। তাই যাব ভাবছি।"

"আমিও যাব," বলে আমি নেচে উঠলাম।

ঋজুদা বলল, "পাগলামি করিস না। এ শিকারে যাওয়া নয়, শিকারি ধরতে যাওয়া। তুই কেন এর মধ্যে যাবি?"

আমি বললাম, "যদি আমাকে না নিয়ে যাও, তাহলে আমি কী করব দেখো।"

ঋজুদা বলল, "তুইও কি শেষে আমার মতো অশিক্ষিত হয়ে থাকবি? জংলি হয়ে যাবি? তোর মা-বাবা কী বলবে আমাকে?"

আমি বললাম, "তুমি অশিক্ষিত?"

"অশিক্ষিত নই? এম-এ বি-এ পাশ করাকে কি শিক্ষা বলে? আসল শিক্ষা তো শুরু হয় বি-এ এম-এ পাশের পর। শুনিস্‌নি সেই কথা? একজনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, 'হোয়াট ইজ দ্য পারপাজ অফ এ ইউনিভার্সিটি?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'টু ব্রিং দ্য হর্স নিয়ার দ্য ওয়াটার অ্যান্ড টু মেক ইট থার্স্ট।' মানে বি-এ এম-এ পাশের পরই আসল জ্ঞানের শুরু। ইউনিভার্সিটি শুধু ছেলেমেয়েদের মনে জানার ইচ্ছেটুকুই জাগিয়ে দেয়। তার বেশি কিছু নয়। যদি কেউ মনে করে যে, ডিগ্রী পেলেই শিক্ষা শেষ হল তবে তার ডিগ্রী পাওয়াটাই বৃথা। যে যাই-ই করুক, যাই-ই পড়ুক, শেখার কি শেষ আছে? মৃত্যুর দিন অবধি মানুষকে শিখতে হয়। সব মানুষকেই। যে যে-ভাবে শেখে। কেউ বই পড়ে, কেউ অন্যভাবে।"

তারপরই বলল, "তুই নিশ্চয়ই বোরড্ হয়ে যাচ্ছিস। ভাবছিস, এই সুন্দরবনে এসেও ঋজুদা জ্ঞান দিচ্ছে।"

আমি বললাম, "না। মোটেই না। আসলে কী জানো? আমার এই বন-জঙ্গল পশু-পাখি, এই খোলা-আকাশের জীবন, তোমার সঙ্গে ঘোরা—এই সব ভাল লাগে বড়। তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আমি বন-জঙ্গলকে যে কী ভালবেসে ফেলেছি, তা কী বলব। আমার ইচ্ছে আছে আমি একোলজি নিয়ে পড়ব।"

ঋজুদা বলল, "খুব ভাল কথা। অনেক কিছু করার আছে ঐ বিষয়ে। তুই বন-জঙ্গল ভালবাসিস, একথা বুঝতে পেরেছি বলেই অনেক বিপদের মধ্যেও তোকে আনি। অনেক ঝুঁকি নিয়ে।"

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, "বিপদের মধ্যে যে আনন্দ খুঁজে না পায়, কী শহরে কী জঙ্গলে যার জীবনে কোনো চ্যালেঞ্জ নেই, প্রতিবন্ধকতা নেই, প্রবলেম নেই, তার ধার বেশিদিন থাকে না। সে ভোঁতা হয়ে যায়।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "এই সব বুঝতেই তো জীবনের অর্ধেক চলে গেল আমার। তোরা তাড়াতাড়ি শুরু কর। জীবনে যে যত ছোটবেলায় ঠিক করে—কী সে করতে চায় জীবনে, তার জীবনের গন্তব্য কী—সে তত বড় হয়। এই পৃথিবীতে সময়ের চেয়ে দামী আর কিছুই নেই। এখন ভাবি। আর জীবনটা একটা ম্যাটার অফ প্রায়োরিটি। কোন্‌টা আগে, কোন্‌টা পরে, কোন্ জিনিসটার কত দাম তোর কাছে, এইটে ঠিক করে নিয়ে মন প্রাণ দিয়ে সেই জিনিসটার জন্যে লেগে পড়্—নিশ্চয়ই তা পাবি। তোরা কত ছোট। কত কী করার আছে তোদের জীবনে। তোরা জীবনে মানুষের মতো মানুষ হয়ে ওঠ —শুধু শরীরে মানুষ নয়—সত্যিকারের মানুষ। এইটে দেখে গেলেই তো বড়দের আনন্দ।"

এই অবধি বলেই, আবার ঋজুদা বলল, "দেখ্‌লি তো তোকে আবার কেমন জ্ঞান দিলাম। বুড়ো হয়ে যাচ্ছি আসলে। মানুষ যত বুড়ো হয় তত বেশি জ্ঞান দেওয়ার টেনডেন্‌সি হয়, জানিস্।"

আমি বললাম, "মোটেই তুমি বুড়ো নও। আর আমার এসব কথা শুনতে খুব ভাল লাগে। আমি আমার বন্ধুদেরও বলব।

তোমার মতো সকলের যদি একটা করে দাদা থাকত।"

ঋজুদা হাসল। বলল, "তাহলে দেশসুদ্ধ ছেলে তোর মতো বকে যেত; জংলি হয়ে যেত।"

আমি বললাম, "অনেকক্ষণ অন্য সীরিয়াস কথা হয়েছে। এবার আবার গল্প বলো।"

ঋজুদা চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে শালটাকে জড়িয়ে নিল গায়ে ভাল করে। হু-হু করে ভেজা-হাওয়া বইছে। সুন্দরবনে এমনিতে শীতকালে বেশি শীত মোটেই থাকে না, কিন্তু এই ঝড় বৃষ্টির জন্যে দারুণ ঠাণ্ডা পড়েছে।

ঋজুদা বলল, "জেঠুমণি তখন খুব ভাল শিকারি। প্রথম শিকার-জীবনের গল্প সব নিজেই হাসতে-হাসতে বলেন সকলকে। এটা যে জেঠুমণির কত বড় গুণ ছিল, কী বলব। কটা লোক নিজেকে নিয়ে রসিকতা করতে পারে? নিজেকে নিয়ে রসিকতা করতে হৃদয়ের উদারতা লাগে।

"যাই-ই হোক, জেঠুমণি তো শেষ বয়সে প্র্যাকটিস প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। অনেক ব্যবসার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন ধীরে-ধীরে। চা-বাগান নিয়েছিলেন একটা ডুয়ার্সে। ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের বাংলোটা দারুণ ছিল। একবার শীতে গিয়েছিলাম ক'দিন। সেবারই এই ঘটনাটা ঘটে যায়।

"একদিন জেঠুমণি আমাকে বললেন, 'শুয়োর মেরে তাড়া-তাড়ি ফিরিস ঋজু—একজন নতুন বাঙালি প্ল্যান্টার এসেছেন এখানে। তিনি খেতে আসবেন। আসলে এই বাগানটা বহুবার হাত-বদল হল। এখন যিনি কিনেছেন তাঁর সঙ্গে আলাপ নেই আমার। ছোট্ট বাগান। তার বুড়ো ম্যানেজারের সঙ্গে বহুদিনের জানাশোনা। তিনি ফোন করে অনেকদিন হল বলছেন যে, আমার নতুন মালিককে নিয়ে আপনার কাছে আসব—উনি আলাপ করতে ব্যগ্র। তাই আজকে খেতে বলেছি তাঁকে। ভদ্রলোক কলকাতার লোক। বোধহয় বাগান সম্বন্ধে জানতে টানতে আসছেন। তোর কথাও বলেছি তাঁকে। তাড়াতাড়ি ফিরিস।'

"সেদিন বাংলোয় ফিরেই দেখি একটি রোল্স-রয়েস্ গাড়ি দাঁড়িয়ে। উর্দিপরা ড্রাইভার ও পেয়াদা গাড়িতে বসে আছে শীতের মধ্যে। আমি তাদের নামিয়ে এনে জেঠুমণির লোকদের চা-টা খাওয়াতে বললাম। দরোয়ানরা বাইরে আগুন করেছিল। ওদের বললাম ওখানে বসে গল্প-টল্প করতে, গাড়িতে ঠাণ্ডায় বরফ হয়ে যাবে না হলে।

"বিরাট ড্রইং-রুম জেঠুমণির। ওয়াল-টু-ওয়াল কার্পেট। দেওয়ালে ও চারপাশে মাউন্ট করা বাঘ, ভাল্লুক, বাইসনের সব ট্রফি। তারই মধ্যে কোঁচানো ধুতি, দশহাজারি শাল এবং হাতে রুপো-বাঁধানো লাঠি নিয়ে এক ডিস্পেপ্টিক ভদ্রলোক বসে আছেন দেখলাম।

"উনি যে বিরাট বড়লোক তা ওঁর সাজপোশাকে, কথায়-বার্তায় ফুটে বেরোচ্ছে। তাঁর সামনে জেঠুমণি একটা লুঙ্গি পরে তার উপর খদ্দরের পাঞ্জাবি পরে একটা খেস্ গায়ে দিয়ে বসে আছেন।

"পোশাক-আশাক সম্বন্ধে জেঠুমণির চিরদিন একটা প্রচণ্ড নিঃস্পৃহতা ছিল। বলতেন, পুরুষ মানুষের পরিচয় তার গুণে—পোশাক দিয়ে কী হবে? সাজানো-গোছানো ড্রইং-রুম, এসবই তাঁর বাগানের আগের মালিকের। শুধু ট্রফিগুলোই তাঁর। উনি বাংলোটা ফাঁকা পেলে বোধহয় তক্তপোশ, তাকিয়া, গড়গড়া, জর্দা আর পান দিয়ে ভরে রাখতেন।

"আমি ঘরে ঢুকতেই আমার সঙ্গে ভদ্রলোকের আলাপ করিয়ে দিয়ে জেঠুমণি বললেন, 'এই যে মিস্টার ব্যানার্জি—কুকুর-খাওয়া বাগানের মালিক।'

"তারপরই বললেন, 'বুঝলি ঋজু, মিস্টার ব্যানার্জি খুব ধরেছেন যে, ওঁকে একটা বাঘ মারিয়ে দিতে হবে। তুই যখন আছিস্, তুই-ই একটু চেষ্টা করে দে। আমি তো আজকাল বেরোই না বিশেষ।'

"আমি বললাম, 'নো প্রবলেম্। কত মাকাল ফলে ডুয়ার্সের বাঘ মেরে গেল; আপনি তো মারবেনই।'

"মিস্টার ব্যানার্জির সোনা-বাঁধানো-দাঁত ঝক্মক্ করে উঠল। রুপো-বাঁধানো-লাঠি নেড়ে বললেন, 'কবে? কখন?'

"আমি হেসে ফেললাম। বললাম, 'বাঘ তো বাঁধা নেই। আমি থাকতে-থাকতে সুযোগ-সুবিধা হলেই হয়ে যাবে।'

"'না, না। সুযোগ সুবিধা কী বলছেন—এ ভার আপনাকে নিতেই হবে মিস্টার বোস।'

"আমি বললাম, 'জেঠুমণি যখন আমাকে বলেছেন, আপনার আর কিছু বলার দরকার নেই।'

"'তা হলেও, তা হলেও; কালই আমি আমার রোলস্-রয়েস্ পাঠাব—আপনি আমার বাগানে একবার পায়ের ধুলো দিন।'

"আমার রাগ হল। আমি বললাম, 'আমি জীপ নিয়ে চলে যাব। আপনার গাড়ি পাঠাবার দরকার নেই কোনো।'

"'তাহলে আমার ওখানেই খাওয়া-দাওয়া।'

"আমি বললাম, 'ব্রেকফাস্ট খেয়ে যাব—আপনার ওখানে চা খাব এক কাপ। খাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হবেন না।'

"তারপরই ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি কী করেন?'

"আমি বললাম, 'ভ্যাগাবন্ড্ই বলতে পারেন। কিছুই করি

না। একটু লেখালিখি করি।'

"'ওঃ বুঝেছি।' ভদ্রলোক বললেন।

"জেঠুমণি বুঝলেন, আমি চটেছি।

"তাড়াতাড়ি বললেন, 'শুয়োর পেলি? তোর সঙ্গে সিলভারস্টোন গেছিল, না একাই গেলি?'

"বললাম, 'সিলভারস্টোন গেছিল, চাওলাও গেছিল, বাগরাকোটের ডনাল্ড ম্যাকেঞ্জিও এসেছিল। সবসুদ্ধ ছ'টা শুয়োর পেলাম জেঠুমণি। সব ডনাল্ডকে দিয়ে দিয়েছি—কাল ওর বাড়িতে বার-বী-কিউ হবে। তোমাকে যেতে বলেছে বিশেষ করে। ফোনও করবে কাল তোমাকে।'

"জেঠুমণি বললেন, 'যাব নিশ্চয়ই। তবে তোর জেঠিমাকে শুয়োর-ফুয়োরের কথা বলিস না। পুজো-আর্চা করে। আমি ম্লেচ্ছ ব্যাধ—ও বেচারির মনে দুঃখু দিয়ে লাভ কী?'

"আমি উঠে এলাম চান করতে মিস্টার ব্যানার্জিকে বলে: বললাম, 'খাওয়ার সময় দেখা হবে।'

"পরদিন সকালে গেলাম জীপ নিয়ে জেঠুমণির বাগানের একজনকে সঙ্গে করে। কুকুর-খাওয়া বাগানের পথ জানা ছিল না।

"বাগানটা ছোট্ট, ছিমছাম। একারেজ বেশি না হলেও ভাল করে দেখাশুনা করলে ভালই চলার কথা। চায়ের কোয়ালিটি নাকি খুব ভাল।

"মিস্টার ব্যানার্জি খুব যত্নআত্তি করলেন। দেখলাম, তাঁর বাংলোর বারান্দায় ইংল্যান্ডের রাজা-রানীর সব ছবি। তাঁর বাবা-ঠাকুর্দারা রায়বাহাদুর রায়সাহেব। তাঁদের দেওয়া ভোজের আসরে বাংলার সাহেব লাট সস্ত্রীক। দেশ স্বাধীন হওয়ার এত বছর পরও এমন মনোবৃত্তি অবাক করল আমাকে। এই সব দেখে, এখনও এখানে যে গুটিকতক অশিক্ষিত ও আধা-অশিক্ষিত সাহেব ম্যানেজার-ট্যানেজার আছে তারা মিস্টার ব্যানার্জিকে কী-ভাবেন তা মনে করে লজ্জা হল।

"যাই হোক, চায়ের মধ্যেই দু তিনটি জায়গায় আমি বললাম, কুকুর এবং ঘোড়া বেঁধে রাখতে। চিতাবাঘ তো জানিসই পোষা কুকুর খেতে খুব ভালবাসে। আর বড়-বাঘের তন্দুরি-চিকেন হচ্ছে ঘোড়া। বলে এলাম যে, রোজই বিকেল চারটেতে ওগুলো বেঁধে দিতে—সকালে খুলে নিতে। যদি কোথাও কিল হয়, তাহলে আমাকে ফোনে জানাতে।

"মিস্টার ব্যানার্জি আমি আসার সময় আমার হাতে একটা খাম দিলেন। বললেন, 'এতে পাঁচশো টাকা আছে। আপনি কেন আমার জন্যে মিছিমিছি সময় নষ্ট করে আমাকে বাঘ মারাবেন?'

"আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কী বলব ভেবে না পেয়ে বললাম, 'মিস্টার ব্যানার্জি, আপনি খুব বড়লোক হতে পারেন, কিন্তু ভদ্রলোকদের সঙ্গে মেলামেশা বোধহয় বিশেষ করেননি। আপনি আমার জেঠুমণির পড়শি বলে আর কিছু বলছি না আপনাকে। এটা রাখুন।'

"বলেই চলে এলাম।

"কথাটা জেঠুমণিকে বলিনি। বললে, তুলকালাম কাণ্ড হত। কারণ জেঠুমণির বয়স হয়েছে। এই নির্জন জায়গায় প্রতিবেশী একে অন্যের উপকারে আসে অনেক।"

আমি বললাম, "তারপর কী হল?"

ঋজুদা বলল, "বলছি। তার পরের দিন ফোন এল সকালে যে, চিতাবাঘে কুকুর মেরেছে। গেলাম তক্ষুনি। কুকুরটার পেছন থেকে একটু খেয়েছে এবং তুলে নিয়ে গিয়ে একটা নালার মধ্যে রেখেছে। নালার কাছে বড় গাছ ছিল না মাচা বাঁধার মতো। তবে একটা কেসিয়া গাছ ছিল—তিন মানুষ সমান উঁচু হবে। তাতেই মাচা বাঁধলাম। দু'জন লোক বসতে পারে এরকম মাচা।"

(ক্রমশ)

সহজে ইংরেজি

প্রশ্ন করো

চামেলির ইসকুলের বাস এসে গেছে। মনে করো তোমাদের বাড়ি আর চামেলিদের বাড়ি একদম পাশাপাশি। দোতলার জানালা দিয়ে তুমি দেখছ। তোমার একটু গা গরম হয়েছে, তাই ইসকুল যাওনি। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে খুব ভাল লাগছে। মা বললেন, "কী দেখছিস রে?" "চামেলি ইসকুল যাচ্ছে, দেখছি মা।" মা'র যদি এখন সময় থাকত আর মা জিজ্ঞেস করতেন, "কী দেখছিস এক এক করে বল তো" তাহলে তুমি বলতে:

Chameli's school bus is here.
Chameli is getting into the bus.
Mrs. Roy is standing near the gate.
Chameli is carrying her school-bag in her hand.
She is smiling at her friends.
Her friends are sitting in the bus.
Mrs. Roy is waving her hand at Chameli.
She's saying good-bye to her.

কিন্তু এত সব কথা মা যদি প্রশ্ন করে-করে তোমার কাছে জেনে নিতেন, তাহলে মা'র সঙ্গে তোমার কী রকম কথাবার্তা হত? কতকটা এই রকম:

(a) Has Chameli's school bus come?
(b) Yes, Mummy, Chameli's school bus has come.
(a) What is Chameli doing now?
(b) Chameli is getting into the bus.
(a) Where is Mrs. Roy?
(b) Mrs. Roy is at the gate.
(a) Is Chameli grave?
(b) No, Chameli is smiling.
(a) Has she a bag?
(b) Yes, she has her school-bag.

নিশ্চয় লক্ষ করেছ, ওপরে একটি করে প্রশ্নের সঙ্গে একটি করে উত্তর দেওয়া আছে। প্রত্যেক প্রশ্নের পাশে টিক মার্কা (✓) দাও। এবারে ভাল করে দ্যাখো, প্রশ্নের বাক্যগুলো আলাদা ধরনের। কী রকম আলাদা ধরনের তা নীচের দুটো বাক্য দেখে আবার বুঝে নাও।

Is Chameli going to school?
Chameli is going to school.

এইবার চামেলিদের সকলের বিষয়ে যতগুলো পারো প্রশ্ন তৈরি করো, যে-সব প্রশ্নের উত্তর তোমরা আগেই জেনে গেছ। যেমন ধরো—

Who is Mr. Roy? Has Chameli a brother?

প্রসাদ

দুঃসাহসিক অভিযান

ম্যাগেলান

ম্যাগেলানের জন্ম হয়েছিল ১৪৮০ সালের কাছাকাছি সময়ে, পর্তুগালে। তাঁদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল। ১৫১৩ সালে ম্যাগেলান মরোক্কোয় যান ও নিজের দেশের জন্যে যুদ্ধ করে আহত হন। কিন্তু পর্তুগালের রাজা তাঁকে তাঁর বীরত্বের জন্যে কোন রকম স্বীকৃতি জানালেন না। রাজার এই ব্যবহারে মনে-মনে খুব দুঃখিত হয়ে ম্যাগেলান স্পেনে চলে গেলেন। তিনি পশ্চিম দিকে যাত্রা করে দক্ষিণ আমেরিকা গিয়ে সেখান থেকে কোনো প্রণালীর সাহায্যে ওই মহাদেশ পার হয়ে মলঙ্গা-দ্বীপে যাওয়ার একটা নতুন পথ আবিষ্কার করার সংকল্প করলেন। স্পেনের রাজা সম্মতি জানালেন। ম্যাগেলান ২০শে সেপ্টেম্বর ১৫১৯ সালে পাঁচটা জাহাজ নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। তাঁর মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল যে, কোনো একটা প্রণালী অ্যাটলান্টিক মহাসাগরকে প্রশান্ত মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত করেছে। অবশেষে ম্যাগেলান ৩১শে মার্চ ১৫২০ সালে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলে এসে পৌঁছলেন। সেখানে নানা জায়গায় কয়েক মাস কাটিয়ে অক্টোবরের মাঝামাঝি আবার যাত্রা শুরু করলেন। ২১ অক্টোবর ১৫২০ সাল অভিযানের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় তারিখ, কারণ সেইদিনই দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তে দুটি মহাসাগরকে যুক্ত করেছে যে প্রণালী, তার খোঁজ পাওয়া গেল। পরে ওই প্রণালীটির নামকরণ করা হল ম্যাগেলান প্রণালী। প্রণালীটি যদিও দৈর্ঘ্যে মাত্র ৩০০ মাইল, কিন্তু তা পার হতে ম্যাগেলানের একমাস সময় লেগে গেল। ম্যাগেলানের দুটো জাহাজ আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বাকি তিনটে জাহাজ নিয়ে ম্যাগেলান বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরে এসে পৌঁছলেন। খাবার ফুরিয়ে এসেছিল—তাঁরা হলুদ রঙের জল আর পোকায়-ভরা বিস্কুট খেয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। এমন কী, খাবার হিসেবে ইঁদুরেরও চাহিদা খুব বেড়ে গেল। ৯৮ দিন সমুদ্রে কাটানোর পর শেষ পর্যন্ত একটা দ্বীপে এসে টাটকা ফলমূল খেয়ে সকলের প্রাণ বাঁচল। দ্বীপের অধিবাসীরাও তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানাল। ম্যাগেলান অনেক দ্বীপে অভিযান চালিয়ে সেখানকার প্রধানদের সঙ্গে ভাব করলেন। তিনি মলঙ্গা-দ্বীপ অর্থাৎ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেও গেলেন। এইভাবে তাঁর অভিযানের উদ্দেশ্য সফল হল। তিনি পশ্চিম-অভিমুখে যাত্রা করে পূর্বদিকের মলঙ্গা দ্বীপে পৌঁছলেন; দুটো মহাসাগরকে যা যুক্ত করেছে, দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ বিন্দুতে এমন একটি প্রণালীরও সন্ধান পেলেন। মনে-মনে তাঁর আশা ছিল যে, তিনি এবারে স্পেনে ফিরে গিয়ে রাজার কাছ থেকে মোটা পুরস্কার পাবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশত ২৭শে এপ্রিল ১৫২১ সালে ম্যাকটান দ্বীপের স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে একটা দাঙ্গায় তিনি মারা যান, তাঁর আর দেশে ফিরে গিয়ে পুরস্কার নেওয়া হল না। বাকি অভিযাত্রীদের দুর্গতিও চরমে উঠল। স্থানীয় উপজাতির লোকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ১৫২২ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি মাত্র জাহাজ নিয়ে তারা স্বদেশের পথে যাত্রা করল। সারা পৃথিবী পরিক্রমা করে ম্যাগেলানের যাত্রা শুরু করার দিন থেকে তিন বছর পরে তারা স্পেনে এসে পৌঁছয়।

দিদিমণি

মণিমেলার খবর

কেন্দ্রীয় সমাচার

গত ১৪ নভেম্বর বিশ্ব শিশু-দিবস উপলক্ষে মণিমেলা মহা-কেন্দ্রের নিয়মিত শাখাকেন্দ্রগুলি বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রভাতফেরি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, খেলাধুলোর প্রদর্শনী। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মূল অঙ্গ ছিল।

বন্যাত্রাণে মণিমেলাগুলির বিভিন্ন কার্যক্রম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। মণিভাইবোনেরা নিজেদের টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে ত্রাণ-তহবিলে অর্থসাহায্য করেছে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে অর্থ বস্ত্র ও খাদ্যসম্ভার সংগ্রহ করে ত্রাণ-তহবিলে জমা দিয়েছে। কর্মীরা অনেক জায়গায় নিজেরাই বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেছে সংক্রামক রোগের ইঞ্জেকশন দিয়েছে পানীয় জল পরি-শোধনের ব্যবস্থা করেছে ওষুধপত্র দিয়ে সহায়তা করেছে।

১৯৭৯ সালটি রাষ্ট্রসঙ্ঘ আন্তর্জাতিক শিশু-বৎসর হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার, রাজ্য কমিটী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় মণিমেলা মহাকেন্দ্র এই বছরটি যথাযথভাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই উপলক্ষে কয়েকটি স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করা হয়েছে। ৭ জানুয়ারি এক বর্ণাঢ্য পথযাত্রার মাধ্যমে উদ্বোধন-অনুষ্ঠান হচ্ছে। সারা বছর ধরে সাংস্কৃতিক ও খেলাধুলোর বিভিন্ন প্রতি-যোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিশুদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি দীর্ঘমেয়াদি গঠনমূলক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কর্মী-শিক্ষণের স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপনের জন্য জমি সংগ্রহ করা হচ্ছে। ২৫ থেকে ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৭৯ একটি শিশু-উৎসব,শিশুদের নিয়ে জাতীয় সংহতি-শিবির স্থাপনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটবে।

আঞ্চলিক সংবাদ

বারাসাত আঞ্চলিক প্রাক্-নায়ক শিক্ষণ শিবির সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্দিষ্ট শিক্ষণসূচী অনুসারে মণিমেলার শিশু-কল্যাণ কর্মীরা খেলাধুলো সাংস্কৃতিক ও শিল্পকাজ ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের কাছে তালিম নিয়েছে। একই সঙ্গে আঞ্চলিক সমবেত ব্যায়াম ও কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতাও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে শেষ হয়েছে।

বীথি-সংবাদ

বর্ধমান পল্লীভারতী মণিমেলার বার্ষিক ক্রীড়াপ্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক উৎসব সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। নবদ্বীপ বিদ্যার্থী মণিমেলা স্থানীয় রাস-উৎসব উপলক্ষে এক স্বেচ্ছাসেবক শিবির পরিচালনা করে। হাওড়ার মিলন বীথি মণিমেলার ভাইবোনেরা স্থানীয় এক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় বহু ব্যক্তিগত পুরস্কারসহ দলগত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে প্রশংসা অর্জন করেছে। গাইঘাটার সূর্য সেন স্মৃতি মণিমেলা আয়োজিত ভাইয়েদের খো-খো নক-আউট প্রতিযোগিতা সমাপ্ত হয়েছে। বিরাটির পল্লী মণিমেলা আয়োজিত দুটি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল সম্প্রতি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। যাদবপুরের অনির্বাণ মণিমেলা দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য এক অবৈতনিক কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা করেছে। বরানগর রবীন্দ্র মণিমেলার ষষ্ঠ বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসব সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিমতার নারায়ণপল্লী মণিমেলা স্থানীয় দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য অবৈতনিক কোচিংয়ের ব্যবস্থা করেছে।

বুলাই

গিরিধারী কুণ্ডু

ছুটতে-ছুটতে এসেছে নেংটি ইঁদুর।

"আজকের খবরের কাগজ দেখেছেন?"

মেজাজ ভালই ছিল। তবু চমকে উঠলেন সিংহ রাজা।

"কেন, কী খবর বেরিয়েছে?"

আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা তালপাতা তুলে ধরল নেংটি। বলল, "এই দেখুন এখানটায় কী লিখেছে!"

খবরের কাগজ বলতে এখানে তালপাতাকেই বোঝায়। খবরের উপর চোখ বোলাতে বোঝা গেল, রাবংলা ফরেস্টের পেটুক শেয়ালবাবু আগামীকাল তিনধারিয়া বেড়াতে আসছেন।

সিংহমশায় এখানকার ফরেস্টের বর্তমান রাজা। বয়েস হয়েছে অনেক। ভাল দেখতে পান না চোখে। পেতলের সরু ফ্রেমে গোল কাচ-বসানো চশমা ব্যবহার করেন। কাঠের খুঁটির উপর থেকে চশমা তুলে নিয়ে খবরটা আরও কয়েকবার পড়লেন।

সাদা ভুরু দুটো কুঁচকে গম্ভীর গলায় বললেন, "তাই তো! এখন কী করা যায় নেংটি? এই রাবংলা ফরেস্ট কোথায় আছে রে?"

নেংটি তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, "সিকিমের উত্তরে এই রাবংলা ফরেস্ট। এর সম্পর্কে আপনি হয়তো বিশেষ কিছু জানেন না!"

সিংহ রাজা গর্জন করে উঠলেন।

"নেংটি, এ কথার মানে?"

নেংটি ভয়ে-ভয়ে বলল, "এ শেয়ালটাকে সবাই বুলাই নামে ডাকে। ও ভীষণ পেটুক আর পাজি। দেখতে মহিষের মতো একেবারে কালো। ওর বাবা ছিল ওখানকার পাঠশালার হেড-মাস্টার। মুরগি, হাঁস, পায়রা, বাঘ, কুমির, এদের বাচ্চারা ওর বাবার পাঠশালায় পড়াশুনা শিখত।

"বুলাইয়ের বাবা করত কী, ইচ্ছে হলেই ওইসব বাচ্চাকে একের পর এক মেরে খেয়ে ফেলত। মাঝে মাঝে বাচ্চাদের বাবারা পাঠশালায় খবর নিতে গেলে ওই হেডমাস্টার বলত—'কোর্স কমপ্লিট না হলে ওদের সঙ্গে দেখা করা যাবে না।'

"অবশ্য বেশি জোর করলে একটা থলে নিয়ে আসত সামনে। অন্য কারুর বাচ্চাকে দূর থেকে একটুখানি দেখিয়ে পরক্ষণে থলের মধ্যে রেখে বলে দিত—'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনি এবার বাড়ি যান। আপনার বাচ্চা ভালই আছে। এখুনি ওদের নিয়ে আমি ক্লাসে যাব। নমস্কার।

"ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল একদিন। গ্রামের সব জীবজন্তু মিলে রাগে-দুঃখে শেয়াল পণ্ডিতকে পিটিয়ে মেরে ফেলল। সেই থেকে পেটুক শেয়াল, মানে এই বুলাই সবার কাছে বলে বেড়াত, সে পাঠশালার মাস্টার হবে না। মাছ-মাংসও খাবে না। ফলমূল খেয়ে দিন কাটাবে শুধু।"

রাজামশায় এতক্ষণ মন দিয়ে সব শুনছিলেন। এবার সত্যি সত্যি তিনি চিন্তায় পড়লেন। সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বললেন, "নেংটি, তুই এত খবর কোত্থেকে পেলি? খবরের কাগজে এসব তো লেখা নেই!"

ইয়া বড় সরু লেজখানা দুকানে দুবার ঠেকিয়ে জানিয়ে দিল নেংটি, "আমার অপরাধ নেবেন না রাজামশাই। আজকের কাগজ দেখে হাটে সব এরকম কথাই বলছিল।"

সিংহের মাথায় কাঁপুনি। একটু চিন্তা করে নিয়ে বললেন, "স্টেশনে কাল কাকে পাঠাতে পারি, বল দেখি?"

নেংটি কুচিকুচি দাঁত বার করে বলল, "কেন, কালো শেয়ালকে আনতে সাদা হাঁসের দলকে পাঠানোই ঠিক।"

খানিক দূরে দাঁড়িয়ে ছিল রাজহাঁস একটা। নেংটির কথায় সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবাদ জানায়, "সিংহরাজা, আমাদের বাচ্চারা শেয়ালকে আনতে স্টেশনে যাবে কেন? আমাদের গ্রামের কোনো শেয়ালকে পাঠাতে পারেন আপনি।"

না হেসে পারলেন না সিংহরাজা। "রাজহাঁস, তোমার মনে এত ভয় কেন?

গলার স্বর করুণ হয় রাজহাঁসের। "পেটুক শেয়ালের সব কথাই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনেছি আমি। শেয়াল যদি আমাদের বাচ্চাদের গলা কামড়ে দেয়, তখন ওদেরকে কে দেখবে?"

হালুম, হালুম।

চেঁচামেচি শুনে গুহার দরজার কাছটায় তাকালেন রাজা-মশায়। হলুদ বাঘ বলতে-বলতে এগিয়ে আসছে, "কী ব্যাপার? এখানে এত ভিড় কেন? শেয়ালকে অভ্যর্থনা জানাতে আমি যাব সিংহরাজা।"

হালুম বাঘের কথা শুনে এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলেন রাজা।

তিনধারিয়া রেল স্টেশনে হালুম এসে অপেক্ষা করছিল পরের দিনও। গলা ভর্তি জল খেয়ে টয় ট্রেন ছেড়ে দিল। এগিয়ে গিয়েছিল অনেকটা রাস্তা। মালপত্তর রাখার কামরার জানলা দিয়ে কী যেন একটা কালো জিনিস ছিটকে বেরিয়ে পড়ল। রীতিমতো সন্দেহ জাগে হালুমের মনে। এদিকে ছিটকে পড়া কালো ছায়া এগিয়ে আসছে ওরই দিকে। হালুম এগোতে থাকে। মুখোমুখি হল ওরা দুজনে। চার-পাঁচ হাত লম্বা কালো কুচকুচে জন্তুটা হালুমের গা শুঁকছে। ও কিন্তু বুলাই, পেটুক শেয়াল।

দিনের বেলায় প্রকাশ্য রাস্তায় প্রকাণ্ড বাঘকে দেখে বুলাইও কম ঘাবড়ে যায়নি। ভাবছে, বাবা রে! তিনধারিয়ায় দিনের বেলায় বাঘ ঘুরে বেড়ায়!

হালুম বাঘ নরম গলায় প্রথম কথা বলে, "আপনি সিকিম থেকে আসছেন?"

বাঘের কথা শুনে শেয়ালের মনের ভয় দূর হল। সামান্য মুচকি হেসে উত্তর দেয়, "হ্যাঁ, আমি সিকিমের রাবংলা ফরেস্ট থেকে আসছি। আমাকে আপনি বুলাই নামে ডাকতে পারেন।"

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে হালুম বলে চলে, "আমাদের রাজা আপনাকে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছেন। আপনি স্টেশনে নামলেন না কেন? তাহলে আর এতটা মিছিমিছি হাঁটতে হত না। আর আপনি কাল এলেন না কেন?"

প্রশ্ন শুনে রাগ হল প্রচণ্ড। তবু হাসতে হাসতে বুলাইকে বলতে হল, "হ্যাঁ, কালই তো আসার কথা ছিল। জানেন, কাল সোনাদা স্টেশনে ট্রেন এসে পৌঁছতে বৃষ্টি নামল ঝপঝপিয়ে। সে কী বৃষ্টি! গার্ড সাহেব যাত্রীদের জিনিস ঠিক আছে কিনা দেখতে কামরায় উঠলেন। দারুণ রেগে গেলেন আমাকে দেখে। টিকিট দেখাতে বললেন। এদিকে জানলা ছুঁয়ে বৃষ্টির ছাঁট আসায় সমস্ত শরীর ভিজে গিয়েছিল। তাই সোনাদায় নেমে পড়লাম। হাঁটতে-হাঁটতে এক বাড়ির কাছে আসতে, মাংসের ঝোলের গন্ধ এল নাকে। গন্ধটা বিরক্ত করতে থাকায় সে-বাড়িতেই কিছুক্ষণ রয়ে গেলাম। এরপর আর ট্রেন ছিল না। তাই আসতে পারিনি।"

হালুম বুলাইয়ের কথায় কম অবাক হয় না।

"সে কী, মাংসের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে অন্যের বাড়িতে চলে গেলেন? সবাই যে বলছে, আপনি মাছ-মাংস খান না। কথাটা তাহলে মিথ্যে!"

বুলাই বলল, "সত্যি বলতে কী, মাছ-মাংস আমি পছন্দ করি না বেশি।"

মাথা সামান্য ডানদিকে ঘোরাতে, শেয়ালের পিঠের লাল দাগটা বাঘের চোখে পড়ে যায়। তা দেখে হালুম জানতে চায়, "বুলাইবাবু, আপনার পিঠে রক্তের দাগ কেন? কোনো পোকা-মাকড় কামড়েছে?"

একটু হকচকিয়ে গেল বুলাই। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "রেলগাড়ির জানলা দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরুতে গিয়ে একটু লেগে গেছে হয়তো।"

টিকিট না কাটায় গার্ড সাহেব যে পিটুনি দিয়েছেন, সে-কথা বেমালুম চেপে গেল বুলাই।

সিংহরাজার গুহায় শেয়ালকে পৌঁছে দিয়ে নিজের বাড়ি চলে গেল বাঘ।

রাত্তিরে শেয়ালবাবুকে কোথায় থাকতে দেওয়া হবে, তা নিয়ে চিন্তায় পড়লেন সিংহরাজা। বাড়িতে পেটুক শেয়াল বুলাইকে থাকার জায়গা দেবে না বাঘ। অসুবিধে অবশ্য আছে। বাঘের একমাত্র মাসি পুষির সঙ্গে শেয়ালদের বনিবনা হয় না। হাঁসেরাও নিজে বিপদে পড়তে চায় না। শেষ পর্যন্ত গুহায় ঢোকার বাঁ পাশে যে ফাঁকা জায়গা রয়েছে ওখানে বুলাইয়ের থাকার ব্যবস্থা হল।

যাবার আগে সিংহরাজা জানতে চাইলেন, "আপনার জন্যে এখন খাবারের কী ব্যবস্থা করব?"

পেটুক শেয়াল এপাশে-ওপাশে লেজ নেড়ে দুম করে বলে ফেলল, "রাত্তিরে এমন কিছু আমি খাই না। এই ধরুন, তিন চার লিটার দুধ, খাঁটি হলে অবশ্য ভাল হয়। একটু বীট-গাজরের সুপ, আর দু-তিন কেজি আপেল হলেই চলবে।"

বুলাইয়ের কথা শুনে ঘাবড়ে যায় রাজা। তারপর ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে থেকে মনে-মনে ভাবতে লাগলেন, সাধে কি লোকে বলে পেটুক শেয়াল। হাতির চেয়েও ক্যাটার বেশি খোরাক। মনের রাগ তবু এখুনি প্রকাশ করেন না। একটু হেসে বললেন, "কিছু মনে করবেন না। তিনধারিয়ায় গরু-মোষের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। পিঁপড়েদের গোয়াল থেকেও এত দুধ পাওয়া সম্ভব নয়। তবে দু-এক লিটার দুধ নিশ্চয় জোগাড় করা যাবে।"

একটু পরে কাঠের প্রকাণ্ড গামলা শুঁড়ে বেঁধে নিয়ে এল হাতি একটা। বুলাইয়ের সামনে সেটা রেখে না-দাঁড়িয়ে থপথপ পায়ে চলে গেল সোজা। গামলায় ধোঁয়া ওঠা দুধ রয়েছে। জিভ ঠেকিয়ে দুধের সর একটু-একটু করে চেটে মন্তব্য করল বুলাই, "বাঃ, তিনধারিয়ায় এক নম্বর দুধ তো পাওয়া যায়। সিংহমশায়, আমি আসায় আপনাদের কোনো কষ্ট হচ্ছে?"

সিংহরাজার মুখখানা বেশ গম্ভীর হয়ে আছে। একটু কিন্তু-কিন্তু ভাব নিয়ে বলল, "আমাদের আর কী কষ্ট বলুন। ঠাণ্ডার দেশের মানুষ আপনি, এখানকার গরমে কষ্ট পাবার কথা আপনারই। মানুষের বাচ্চারা আজকাল বেশি দুধ খায়। তাই আপনার বেলায় দুধের পরিমাণ একটু কম হল।"

হাসি-হাসি মুখে বলল বুলাই, "সিংহমশায়, আপনার বয়স হয়েছে। এবার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিন। পরে আবার কথা হবে। কিন্তু একটা কথা ছিল।"

সিংহরাজাও হেসে ফেলেন বুলাইয়ের এরকম কথা শুনে।

"কী কথা, চটপট বলে ফেলুন বুলাইবাবু।"

"এখন সাতটা বাজতে চলল। আমার একটা বাতিক আছে। সেবার আসামের ব্রহ্মপুত্রে স্নান করার সময় হঠাৎ কানে জল ঢুকে পড়ে। সেই থেকে কানের ভেতরটা মাঝে-মাঝে কুটকুট করে ভীষণ। এখনও ওই রকম হচ্ছে। আমাদের দেশে এ-সময় গাছের সরু লতারা দুলে-দুলে কানের ভেতরে কাতুকুতু দেয়। এখন—"

সিংহরাজা বললেন, ''আরে এই কথা।''

নেংটিকে চোখ ঘুরিয়ে ইশারা করলেন। বুলাই সামনের এবং পেছনের পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। (আসলে শোয়নি। শোবার ভান করছে মাত্র।)

নেংটি কানের ভেতরে লেজটা সামান্য ঢুকিয়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল। কিন্তু ভয় হচ্ছিল সত্যি। কারণ সিংহরাজা শেয়ালের কানে কাতুকুতু দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে কেটে পড়েছেন। বুলাই যদি একবার হাঁ করে, তাহলে নেংটির ছোট্ট শরীর একেবারে গলা বেয়ে পেটে চলে যাবে। রাজামশায়ের কথাও এদিকে না মানলে নয়।

শেয়াল মিছিমিছি মুখ নাড়তে-নাড়তে ভাবতে থাকে... নেংটি, তোর ওই এক হাত দীর্ঘ লেজখানা আমার কানে ঢুকিয়ে বসে আছিস? এত সাহস তোর। আজ নতুন এসেছি। কোনো ঝামেলা করব না। কাল এ-সময়ে একবার তোকে পাই না, এক সেকেণ্ডে গিলে ফেলব।

কী যেন মনে পড়ে যায়। শরীর ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল বুলাই। বলল, "নেংটি, লক্ষ্মী ছেলের মতো যা তো বাবা, জলদি রাজাকে একবার খবর দে। বলবি, আমি ডাকছি, জরুরি।"

রাজার চোখের পাতা জুড়েছিল ঘুমে। নেংটির ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসলেন, একটু পরে বললেন, "কী রে, ডাকছিস কেন?"

চোখে-মুখে পুরো দুষ্টুমি। বলল, ''রাজামশাই, আপনার অতিথি বুলাই শেয়াল ডাকছে।''

রীতিমতো বিরক্ত বোধ করেন। না গিয়ে তবু উপায় নেই।

সিংহরাজা গর্জন করতে করতে এগিয়ে এলেন। ভুরু কুঁচকে সামনে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার, ডেকেছেন কেন?"

বুলাই বলল, "আপনি দেখছি এর মধ্যেই ভুলে গেছেন। আমার সুপ কোথায়?"

সিংহরাজা রসিকতা করলেন ওঁর সঙ্গে, "এ কী কথা! আপনি না মাংসের সুপ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন? তাহলে কিসের সুপ পাঠাব?"

ভালমানুষি ভাব দেখায় বুলাই। লেজখানা কানে দু-তিন-বার ছুঁইয়ে বলল, "হ্যাঁ, মাছ-মাংসের সুপ খাওয়া কবে থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। গতকাল সোনাদার বৃষ্টিতে এত ভিজেছি যে, শরীরটা এখনো ম্যাজম্যাজ করছে। মনে হচ্ছে জ্বর আসবে রাতে। তাই একটু সুপ খাবার কথা মনে পড়ল। আমি শুধু সুপই খাব। মাংস বা হাড় আপনি বরং খেয়ে নেবেন। আপনারও তো শরীরটা ঝিমিয়ে পড়েছে বেশ।"

রাত আটটা বাজে প্রায়। কোনো দোকান খোলা নেই। এ মুহূর্তে রাজামশায় মাংস বা হাড় কোত্থেকে জোগাড় করবেন? রান্নাই বা হবে কোথায়?

রাজার চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে আঁতকে ওঠে নেংটি। সামান্য হাসি-হাসি মুখে ইশারা করল এবং কানে কানে বলে দিল, "আপনার ঘরে যেসব হাড়গোড় পড়ে আছে, সেগুলো এনে একটু জল আর নুন ঢেলে জ্বাল দিলে সুপ তৈরি হয়ে যাবে।"

সিংহ রাজার মেজাজ ভাল হয় এবার।

নেংটি ওর বন্ধুদের ডেকে আনল। গোটা কয়েক হাড় মুখে বয়ে নিয়ে গেল হালুম বাঘেদের বাড়ি। বাঘের মাসি পুষি অসময়ে নেংটিদের আসতে দেখে অবাক হল। তবু বলল, "কী রে, তোরা আবার এত রাতে কেন এলি।"

সবার আগে নেংটি বলে দেয়, "পাজি বুলাইয়ের খেয়াল হয়েছে এক গামলা সুপ খাবে। আর রান্না করার ভার পড়েছে তোমার ওপর মাসি।"

এত রাতে আর ইচ্ছে হচ্ছিল না রান্নাঘরে যেতে। তবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও দু বালতি জল ঢেলে পুষি সুপ তৈরি করতে বসল।

এদিকে, পেটুক শেয়াল বুলাইকে দেখতে গাঁয়ের সব হাঁসের ছানা, মুরগিদের বাচ্চারা গুহার সামনে জমায়েত হয়েছে। ওরা মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত চোখ বোলাচ্ছিল। ঝোলার মধ্যে মুখ গুঁজে কী যেন খুঁজছিল বুলাই। হাঁস, মুরগিদের দেখতে পেয়ে পেট মুচড়ে ওঠে। সঙ্গে-সঙ্গে সাট করে ঝোলাটা পেছনে সরিয়ে দিল।

হাঁসের ছানারা মুরগিদের বাচ্চাদের বলছে, "জানিস, ওই ব্যাগটায় সিকিমের টফি আছে। আমরা যদি কেড়ে খেয়ে ফেলি, তাই লুকিয়ে ফেলল।"

মুরগিরা বলাবলি করল, "না, না। ওই ব্যাগেতে পৃথিবী সুদ্ধ দেশের মজার-মজার পোশাক রয়েছে।

পেছন ফিরে ওরা সব নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। সে সময় না, ধবধবে একটা ছোট্ট হাঁসের ছানা একেবারে ঝোলার সামনে গিয়ে উপস্থিত। সুযোগ বুঝে শেয়াল হাঁসের গলায় কামড় বসিয়ে লুকিয়ে ফেলল ঝোলার পাশে। ভয়ে হাঁসটা প্যাঁক প্যাঁক শব্দ পর্যন্ত করতে পারল না।

তারপর বুলাই বলল, "এই দুষ্টুরা, শিগগির ঘর যা সব। রাত অনেক হয়েছে। তোদের মায়েরা বকবে'খন।"

হাঁসের ছানারা, মুরগিদের বাচ্চারা ধমক শুনে ছুটে পালিয়ে গেল।

ওরা চলে যেতে ঝোলা সরিয়ে খুশি মনে হাঁসের ছানাকে দেখল। না, মরে গেছে। টুক করে অমনি ঝোলার মধ্যে ফেলে দিয়ে সব্জিগুলো নেড়ে চেড়ে সাজিয়ে রাখল।

একটু পরেই বুলাইয়ের সামনে এক গামলা সুপ পৌঁছে দিয়ে গেল একটা হাতি।

সুপ খেয়ে ঢেঁকুর তুলতে-তুলতে মাঠে ঘুরতে গেল বুলাই। যাবার সময় ঝোলাটা এক কোণে পাথরের টুকরো দিয়ে চেপে রেখে গেল।

ওই ঝোলাটা দেখামাত্র নেংটির প্রথম থেকে যথেষ্ট সন্দেহ হচ্ছিল। এই তো মওকা। বুলাইও ঘরে নেই। চটপট পাথরের টুকরো সরাতে পচা মাংসের গন্ধ ওর নাকে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে ঝোলা উলটে দিল নেংটি। ওদের গাঁয়ের সবার প্রিয় হাঁসের ছানাকে দেখল এবার। পেটুক শেয়াল বুলাই যে পাজি, এবং ধূর্ত, তা নেংটি ভালভাবে বুঝে ফেলল। ঝোলা আগের মতো ঠিক করে রেখে সিংহরাজার গুহায় চলে গেল ব্যাপারটা জানাতে।

খাটিয়ার উপর শুয়ে ছিলেন রাজা। ডান কানের কাছে লেজ দিয়ে একটু সুড়সুড়ি দিল। ঘুম ভাঙল সিংহরাজার। তবু অনেক কষ্টে ঘুম-চোখ মেলে বললেন, "কী রে নেংটি, আবার কী খবর নিয়ে এলি?"

নেংটি বলল, "রাজামশায়, এখুনি বুলাইকে তাড়াতে হবে। ও না, ছোট্ট হাঁসের ছানাকে মেরে নিজের ঝোলায় লুকিয়ে রেখেছে।"

সিংহরাজা বললেন, "কী সাংঘাতিক কথা। শেয়ালটা কম জ্বালাচ্ছে না তো! নেংটি, তুই একটু ওর ওপর কড়া নজর রাখ। আরেকটা কাজ অবশ্যই করবি। সবাইকে খবর দিয়ে আয়, কাল ভোর ছ'টায় পাগলাঝোরার কাছে জরুরি সভা বসবে। সবাইকে উপস্থিত থাকতেই হবে।"

নেংটি দৌড় দিল হালুম বাঘ, পুষি, সাদা শেয়াল, লাল-ঝুঁটি কাকাতুয়া আর হাতিকে খবর দিতে। হাঁপাতে-হাঁপাতে ফিরে এসে দেখে, বুলাই তখনও আসেনি।

মামনের স্বপ্ন

গালে হাত দিয়ে পাকা গিন্নীর মতো তাতু বলল ঃ দেখেছিস ? বাড়ীর সামনেটা কি রকম করে ফেলেছে, টিন দিয়ে ঘিরে রাস্তাঘাট খুঁড়ে একাকার।

পাশে বসেছিল মামন, বলল ঃ বলছিস কি ? ওতো পাতাল রেল তৈরী হচ্ছে।

পাতাল রেল না হাতি। বাবা বলেছে, ওই পাতাল রেল-টেল এ জন্মেও হবে না।

মামন গম্ভীর হয়ে গেল। বলল : কাল নেনো পাতাল রেল এর গপ্প বলছিল। মামাকে নেনো বলে ডাকে মামন।

কি বলছিল ?

বলছিল কি, এই তো আর কটা বছর মাত্র। তার মধ্যেই পাতাল রেল এর কাজ শেষ হয়ে যাবে। তখন মামনকে আর বাসে করে স্কুলে যেতে হবেনা। সামনের মোড় থেকে উঠবে আর কয়েক মিনিটের মধ্যে স্কুলে গিয়ে নামবে। গুঁতোগুঁতি ভীড় নেই। নিশ্চিন্তি।

তাতু চোখ বড় বড় করে মামনের কথা শুনছিল। মামন বলল ঃ স্কুলের বাস কি বিচ্ছিরি বাবা, সেই সকালে বাসে ওঠো, আর স্কুলের শেষে বাড়ী ফিরতে বিকেল পেরিয়ে যায়।

তাতু বলে উঠল ঃ বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি।

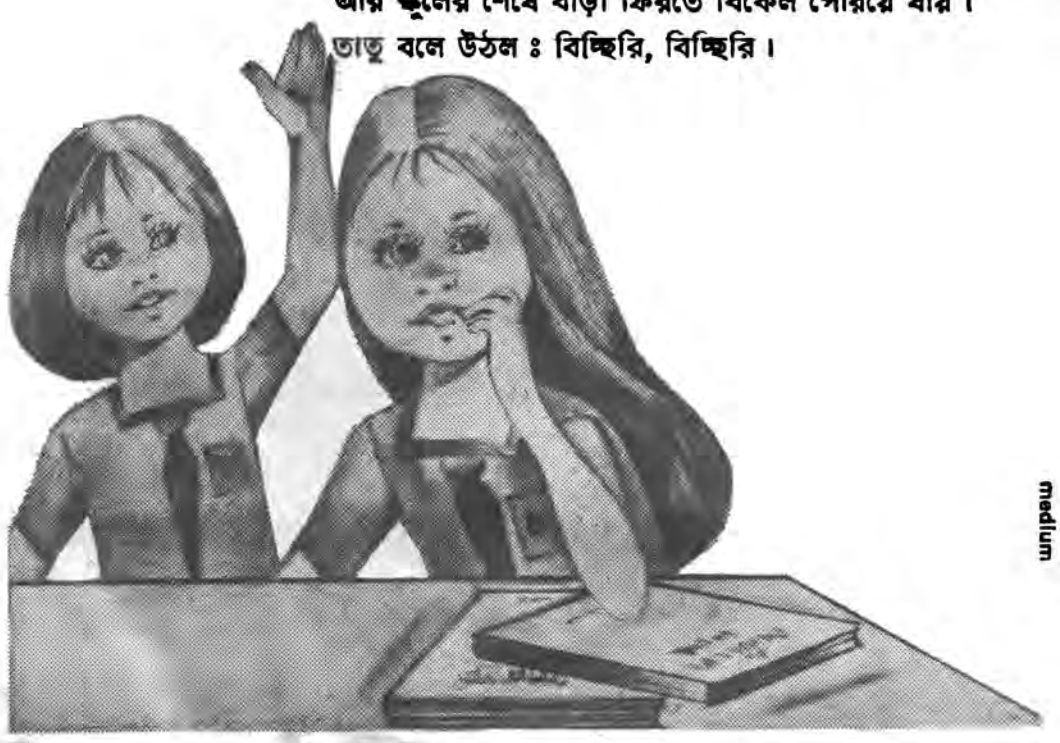

medium

মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

বুলাইয়ের থাকার ঘরে এক হাত উঁচু জংলা গাছের নীচে ঘাপটি মেরে বসে রইল নেংটি। খানিক বাদে লেজ দুলিয়ে ঘরে ঢুকল বুলাই। শোবার চেষ্টা করল ঝোলাটা মাথার নীচে দিয়ে।

ঘুম কী করে আসবে। মশারা ঢ্যাঙা-ঢ্যাঙা পা ছুঁড়ে লাথি মারছে বুলাইকে। ভয় দেখাবার জন্যে বুলাই ওদের বলল, "ভীষণ দুষ্টু তোরা, বিরক্ত করিস না। একটু ঘুমতে দে। রাবংলা থেকে এখানে আসতে কম কষ্ট হল আমার!"

এক নাগাড়ে ঘণ্টাখানেক মশা তাড়াতে-তাড়াতে পেটুক শেয়ালের পেট খালি হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি মুখ ঢুকিয়ে ঝোলা থেকে বার করে আনল হাঁসের ছানাকে। দাঁত দিয়ে পালক ছাড়াতে ব্যস্ত ছিল। ইঁদুরের চাপা গলা কানে এল। "চিঁ চিঁ চিঁ। আমি দেখতে পেয়েছি। পেটুক শেয়াল তুমি হাঁসের মাংস খাচ্ছ।"

চোখ দুটো তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল বুলাই, "আরে, তুই কোথায়? সামনে এসে কথা বল না একবার।"

চোখ মেলে রইল কিছুক্ষণ। চোখে পড়ল না কিছু। ভাবল, ইঁদুর ওর ভয়ে পালিয়েছে। তাড়াতাড়ি হাঁসের ছানাকে মুখে পুরে দিয়ে চিবোতে লাগল। নিশ্চয়ই ওর কাছ থেকে ভাগ বসাবার জন্যে এসেছিল। ছিঁচকেটা কোথায় গেল এখন?

"চিঁ চিঁ চিঁ। আমি দেখতে পেয়েছি।"

এবার বেশ ভয় ধরল বুলাইয়ের মনে। কোথায় বসে কথা বলছে। গম্ভীর পায়ে একটু পায়চারি করল। নেংটিকে তবু চোখে পড়ে না কিছুতে। চারপাশ আবার নির্জন হয়। বুলাইয়ের চোখে সত্যি-সত্যি ঘুম নামে এবার।

আকাশ নীল আলোতে ভরে যায়নি তখনও। নেংটি সিংহ-রাজাকে তুলে দিয়ে ছুট দিল হালুমদের বাড়ি। হালুম বাঘ আর পুষিকে সঙ্গে নিয়ে গেল বড় হাতির বাড়ি। থপথপ পায়ে চলতে ফিরতে হাতির সময় লাগে বেশি। সে-কথা শুনিয়ে সবাই ঠাট্টা করে হাতিকে। সবে ঘুম ভেঙেছে। বিরক্ত হয়ে সেও বলে দিল, "তোমরা দৌড়ও না। আমার ভারি শরীর নিয়ে হাঁটতে দেরি হবে-ই। রাজামশায় সে কথা ভালভাবেই জানেন।"

পাগলাঝোরার কাছেকার সবুজ জঙ্গলে সভা বসেছে। সভায় বনের প্রায় সব জীবজন্তুরা উপস্থিত। হাঁসেরাই প্রথম ওদের রাগ প্রকাশ করল, "আমাদের ছানাকে গত রাত্তির থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। বুলাই নিশ্চয় ওকে সাবাড় করে ফেলেছে। আপনি এখুনি এ বিষয়ে বিচার না করলে, আমরা হাঁসেরা তিনধারিয়া ছেড়ে চলে যাব।"

সিংহরাজা দুঃখ করলেন, "আহা! তোরা রেগে যাচ্ছিস কেন? সবাই মিলে ওকে তাড়াবার জন্যে একটা মতলব ঠিক করতে হবে। সে জন্যেই তো এই সভা। সামান্য একটা বিষয়কে উপলক্ষ করে দেশ ছেড়ে চলে যাবি?"

বাঘেরাও কম রেগে নেই। একজন বলল, "আপনি একবার আদেশ করুন রাজামশায়, আমরা ওর মাংসটুকু খেয়ে হাড়গুলো আপনাকে উপহার দেব'খন।"

হাতি তখন সবেমাত্র সভায় এসে পৌঁছেছে। চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "রাজামশায়, আপনি একবার বলুন শুধু। আমি ওকে পায়ের তলায় ফেলে পিষে মারব।"

সিংহরাজার বয়স হয়েছে। পুরনো দিনের জন্তু। মারামারি, কাটাকাটি পছন্দ হয় না মোটেই। শান্ত গলায় বলতে থাকেন, "আজ একটা কথা তোদেরকে বলছি। হিংসা ভাল নয়। হত্যার বদলে হত্যা নয়। তোরা শান্ত হয়ে বসে কথা শোন্। বুলাইকে এখান থেকে কীভাবে তাড়ানো যায়, সে বিষয়ে আলোচনা শুরু হোক এবার।"

মাথা চুলকে নিয়ে নেংটি ফট্ করে বলে ফেলে, "আমার মতে কলকাতার মস্ত বড় শিকারী টিংলুবাবুর কাছে গিয়ে আমাদের বিপদের কথা বললে ভাল হয়। টিংলুবাবু এখন টুং-এ আছেন। ওঁর কাছে ঘুম-বিস্কুট আছে। বুলাই সুপ খেতে ভালবাসে। সুপের ঝোলের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে ওই বিস্কুট। তবেই ঘুমিয়ে পড়বে বুলাই। তারপর ওর চার পা বেঁধে হয় পাগলা-ঝোরার উপর থেকে ফেলে দেওয়া হোক, নয়ত বস্তায় পুরে সিকিমে পার্সেল করে পাঠিয়ে দেওয়া হোক।"

কথাটা মনে ধরে সবার। এক বাক্যে বেশ বেশ বলে তারিফ করল নেংটিকে। সভা ভেঙে গেল অল্প সময়ের মধ্যে।

বড় হাতিকে সঙ্গে নিয়ে বাঘ, টাট্টু ঘোড়া এবং নেংটি রওনা দিল। প্রায় এগারটা বাজল টুং-এ পৌঁছতে। বাড়ি চিনতে কোন অসুবিধে হল না। বাড়ির সামনে ভিড় দেখে দরোয়ান প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিল একটু। তারপর ভয়ে-ভয়ে ডেকে নিয়ে এল টিংলুবাবুকে। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন টিংলুবাবু, "কী ব্যাপার, তোমরা কেন?"

হাতি শুঁড় তুলে নমস্কার জানাল। নেংটি পুরো ব্যাপারটা গড়গড়িয়ে বলে গেল, "সিকিম থেকে এক শেয়াল এসেছে আমাদের গ্রামে। ভীষণ ধূর্ত শেয়াল। সবাই ওকে বুলাই নামে ডাকে। বলে বেড়ায়, ও খুবই ভাল জন্তু। এদিকে নিরীহ হাঁসের একটা বাচ্চা খেয়ে ফেলেছে কালকে। জীবজন্তুদের ঘুম পাড়ানোর বিস্কুট তো আপনার কাছে রয়েছে। কয়েকটা আমাদের দিন না। ও ঘুমিয়ে পড়লেই ওর চার পা বেঁধে পাগলাঝোরা থেকে ফেলে দেব আমরা।"

নেংটির কথায় গোঁফ সোজা রেখে হো-হো হো শব্দে হাসতে লাগলেন টিংলুবাবু। "আরে, এত ঝামেলায় যাচ্ছ কেন তোমরা? একটা ভিজিট দিলেই আমি বরং তোমাদের গ্রামে গিয়ে দোনলা বন্দুক চালিয়ে ওকে মেরে আসতে পারি।"

হাতি বাঘ ঘোড়া একসঙ্গে বলল, "না, না, টিংলুবাবু, আপনি সামান্য এ ব্যাপার নিয়ে কষ্ট করবেন কেন? আমাদেরকে আট-দশখানা বিস্কুট দিলেই আমরা চলে যাব।"

"আচ্ছা, বুলাইয়ের বয়স কত হবে?

হাতি বাঘ ঘোড়া নেংটি মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। শেয়ালের বয়স জানবার কথা ওদের নয়। আর পেটুক শেয়ালকে গতকালই দেখল প্রথম।

সবাইকে চুপ থাকতে দেখে টিংলুবাবু জিজ্ঞেস করেন আবার, "আচ্ছা, শেয়ালটার ওজন কত হবে আন্দাজে বলতে পারো?"

সত্যি খুব মুশকিলের কথা। ঘোড়া ঘাড় দুলিয়ে জানাল, "ওজন বলতে পারছি না, টিংলুবাবু। কিন্তু হাত চারেক দীর্ঘ।"

মনে-মনে অঙ্ক কষে টিংলুবাবু বলে দিলেন, "ছ থেকে আটখানা বিস্কুট দিলেই ঘুম এসে যাবে। তোমরা দশখানা দিও। গতবারের বিস্কুটে কম কাজ হয়েছে। আজকাল তামাম দুনিয়ায় ভেজালের কারবার চলছে। সবে আফ্রিকা থেকে এই স্লিপিং বিস্কুট এসেছে। পরীক্ষা করে দেখতে পারিনি এখনও। তা তোমাদের তাড়া থাকলে এক ডজন বিস্কুট-ই নিয়ে যাও।"

বিস্কুটের প্যাকেট হাতে পেয়ে হাতির কী নাচ তখন। রাস্তায় জনতার ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসা মুশকিল।

সিংহরাজা শেয়ালের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছেলেন। দূর থেকে বাঘ ডাক দেয়, হালুম, হালুম। একটু আসছি বলে বাইরে এলেন সিংহরাজা। বাঘের একেবারে সামনে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বললেন, "কী রে, পেয়েছিস ঘুম-বিস্কুট?"

বাঘ উত্তর দিল, "পেয়েছি।"

সিংহরাজা বললেন, "তোদের কাছে রেখে দে। সন্ধেবেলায় সুপে মিশিয়ে দিস। সাবধান, কথাটা যেন পাঁচ-কান না হয়।"

এদিকে দুপুরবেলা চার পাঁচ লিটার দুধ, এক হাঁড়ি পান্তা ভাত, বীট গাজরের তরকারি খেয়ে মাঠে ঘুরতে গেল বুলাই। ঝোলাটা কী মনে করে যেন সঙ্গে নিয়েছে। ফিরল সেই ভর সন্ধেয়। নেংটিকে ওর থাকার ঘরে দেখতে পেয়ে খেঁকিয়ে উঠল একটু, "নেংটি, তুই এখানে যে! আচ্ছা, তোর এখন কোনো কাজ আছে?"

খিলখিল করে একগাল হেসে নেংটি জানায়, "পুষি মাসির বাড়িতে যেতে হবে। ওখানেই তো আপনার জন্যে রাতের সুপ তৈরি হচ্ছে।"

নেংটির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বুলাই বলে, "তোর সঙ্গে আমিও যাব ভাই? আজকের রাতটা ভীষণ অন্ধকার। ঘুটঘুট করছে চারপাশে। তোর ভয় করতে পারে।"

একথা শুনে ভয় দেখাবার চেষ্টা করল নেংটিও, "বুলাই-ধাবু, পুষি মাসির বাড়ি যেতে হলে কমপক্ষে দশ কিলোমিটার পথ হাঁটতে হবে। রাস্তায় প্রকাণ্ড এক বাঁশের জঙ্গল পড়বে। ওই জঙ্গলে না, বিরাট সাইজের মশা আছে।"

মশার নাম কানে যেতে বুলাই তিন লাফ মারল। ফাঁকতালে নেংটিও একলাফে বাইরে এসে দৌড়তে থাকে।

সুপ তৈরি শেষ হয়েছে। দশখানা বিস্কুট গুঁড়িয়ে মিশিয়ে দেওয়া হল। এদিকে রান্নার কত দেরি, সে-খবর নিতে এসেছিল নেংটি। ওকে দেখে পুষি বলে ওঠে, "কেমন তৈরি করেছি সুপ একটু চেখে দেখবি নেংটি?"

নেংটি চেঁচামেচি করতে লাগল, "তোমার তো মাসি কম বুদ্ধি নয়। ঘুম-বিস্কুট মেশানো সুপ খেয়ে শেষমেষ আমি ঘুমিয়ে পড়ি। আর এদিকে বুলাই এসে আমাকে খেয়ে ফেলুক।"

আর দাঁড়াল না, রাগ দেখিয়ে বেরিয়ে এল নেংটি।

এক মিনিটের গল্প

সুনন্দা দাশগুপ্ত

সেদিন যখন ঘুম আসে না পিদিম-নেভা রাতে—
পিঠ চুটপুট্। মন উশখুশ। আবছায়া জোছনাতে
পদ্মদিঘির ধারে-ধারে, ঝুপসি গাছের আড়ে,
জোনাকপোকা ঝাড়লণ্ঠন জ্বালছে চুপিসারে।
সোনাল ব্যাঙের মস্ত ছাতা হঠাৎ কেড়ে নিয়ে,
উড়াল দিল মাথায় টোপর, পান্নাসবুজ টিয়ে।
মাঝদিঘিতে ঝলমলানো ময়ূরপংখি নাও
উধাও হল বাইশ দাঁড়ে। নিঝুম ঘাসপাতাও
শিরশিরিয়ে শিউরে কেঁপে বলল আমায় ডেকে,
'মেঘের দেশে যাবে নাকি?' থমকে থেমে থেকে,
পলকপাতে পক্ষীরাজটা দিয়েছে যেই লাফ—
অমনি গেল ঘুমটা ভেঙে। তোতুলতলি সাফ ॥

রাত নটা। বুলাইয়ের খাওয়া শেষ হল। ঢেঁকুর তুলতে তুলতে বুলাই যাচ্ছিল মাঠের দিকে। এমন সময় ওর দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে বললেন সিংহরাজা, "বুলাইবাবু, আকাশে কালো মেঘ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে! এখন আর মাঠে-ঘাটে না গেলেন।"

বুলাই কিন্তু এ কথার আসল অর্থ বুঝল না। বলল শুধু, "ঠিক বলেছেন, সিংহরাজা।"

কথা শেষ হয়নি ওর। এ কী কাণ্ড! বুলাইয়ের মাথা ঘুরছে কেন? পেটের ভেতরটা মোচড় খাচ্ছে। কিছু ভাল লাগছে না এ মুহূর্তে। দৌড়ে বেরিয়ে এল বাইরে। মাটিতে পেট ঠেকিয়ে বেশ কয়েকবার ছুটে-ছুটে গড়াগড়ি খেল। একমনে ঘাস চিবোতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পেট থেকে সব বেরিয়ে গেল ঠিকই।

ফিরে এল থাকার জায়গায়। তখনও সিংহরাজা দাঁড়িয়ে আছেন দেখে রাগের মাথায় বলে ফেলল বুলাই, "আপনারা মোটেই ভাল নন। সুপের ঝোল খাওয়ার পর থেকে আমার মাথা কেমন করছিল। ভাগ্যিস, পেট থেকে বার করতে পেরেছি সব।"

মন্তব্য করলেন সিংহরাজা, "কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়িয়ে আজেবাজে জিনিস খেয়েছেন, ভেবে দেখুন। নিশ্চয়ই আপনার পেট গরম হয়েছিল।"

পিঠের উপর থেকে মশা তাড়াতে-তাড়াতে বিরাট হাই তুলল বুলাই।

"কী জানি, কী হয়েছে!"

সিংহরাজা গম্ভীর পায়ে গুহায় ফিরে এলেন। নেংটিও পেছন পেছন এল। পেছন ফিরে ধমকে জানিয়ে দিল সিংহরাজা, "নেংটি, ঘুরঘুর করিস না! তোদের কোনো বুদ্ধি নেই। ডোজ বেশি পড়েছে। কাল সকালে আবার পাগলাঝোরার জঙ্গলে সভা বসবে। যা, সবাইকে বলে আয়।"

ভোর চারটে বেজেছে। নেংটি রাজাকে ডাকতে এসেছে। গুহায় যাবার সময় এদিকে হঠাৎই নেংটির লেজটা একটু বুলাইয়ের কানে ছোঁয়া লাগে! চোখ-বন্ধ অবস্থায় বুলাই ভাবতে থাকে, কে ওর কানে আচমকা থাপ্পড় মারল? মাথা তুলে ঝাপসা চোখে লক্ষ করল বুলাই। সিংহরাজা নেংটিকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বুলাই, পেটুক শেয়াল যে পিছু নিয়েছে তা সিংহরাজা বা নেংটি বুঝলই না।

সভা শুরু হতে আজ বেশি সময় লাগল না। মুরগিদের একজন নালিশ করল প্রথমেই, "কোক্কোরো-কোঁ-কোঁ। এই দেখুন রাজামশায়, বুলাইয়ের ঝোলা কাল আমরা মাঠে পেয়েছি। আমার বাড়িতে দুপুরবেলায় ঢুকে ও দুটো মুরগিছানা চুরি করে মেরে ফেলেছে।"

বুলাইয়ের লাল ঝোলা আর মুরগিছানাদের দেখে সব জীব-জন্তুরা ভীষণভাবে রেগে গেছে। হাতি কুলোর মতো কান দুটো দুলিয়ে-দুলিয়ে বলে, "আপনার কথা আর আমরা শুনব না, রাজামশায়। আমি ওকে পায়ের তলায় ফেলে মারব।"

হুক্কা হুয়া—হুক্কা হুয়া—। বুলাই ডেকে উঠল। কান দুটো খাড়া করে বলে দিল, "চারিদিক চেয়ে আমার মনে হচ্ছে আমাকে মেরে ফেলার জন্যে এই সভা বসেছে। সভা নয়, যেন হুল্লোড় চলছে। তোমাদের মাথায় সব দুষ্টু বুদ্ধি ভর্তি। আমাকে মেরে ফেলা অত সহজ নয়। হ্যাঁ, আমার বাবা হেডমাস্টার ছিলেন, আমি তার ছেলে। চললাম হে!"

গাছ থেকে লাফিয়ে নেমে সোজা দৌড়তে লাগল বুলাই।

বুলাই তাহলে গাছের ডালে বসেছিল এতক্ষণ। সবাই হতভম্ব। শেয়াল মারার উৎসাহ কোথায় মিলিয়ে গেছে। এ অবস্থা দেখে রাজামশায়, নেংটি তাজ্জব।

ড্রয়ের পরে ড্র

অশোক দাশগুপ্ত

বাকাস মারে

হোল্ডার গোমেজ

বেদী অংশুমান

সানি কি পারবেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই লেখা পড়ার সময়ে হয়তো জানা হয়ে গেছে।

ব্যাপারটা পরিষ্কার করা যাক। অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে বাঙ্গালোর ট্রায়াল ক্যাম্পে ছিলেন বাংলার মিডিয়াম পেস বোলার বরুণ বর্মণ। সানি গাভাসকর একদিন বরুণকে ডেকে বললেন, ''আচ্ছা, কলকাতার পাবলিক আমায় পছন্দ করে না, তাই না?'' বরুণ একটু আমতা-আমতা করে বললেন, ''ঠিক তা নয়, তবে ভিশি (বিশ্বনাথ) খুব পপুলার।'' সানি বললেন, ''তা তো হবেই, কী দারুণ সেঞ্চুরি ও ইডেনে করেছে। তবে, এ-বছর আমিও একটা ভাল ইনিংস কলকাতায় খেলব।''

আমি বিশ্বাস করি, তেমন করে চাইলে গাভাসকর সব পারেন, অন্তত একজন ব্যাটসম্যানের পক্ষে যা করা সম্ভব।

সেই কবে পোর্ট অব স্পেনে দুশো করেছিলেন, তার পর শুধুই সেঞ্চুরি—সানির বোধহয় একঘেয়ে লাগছিল। তাই নিজের শহর বোম্বাইতে সানি খেললেন ২০৫ রানের এক ইনিংস। কেমন ইনিংস লিখছি না, কেননা 'অনবদ্য', 'অসাধারণ', 'দুর্দান্ত' 'চিত্তাকর্ষক' ইত্যাদি বিশেষণগুলো সানির জন্য ব্যবহার করতে করতে ক্লান্তি এসে গেছে।

ভারতের ৪২৪ রানে এর পরের সংগ্রহ চৌহান এবং বিশ্বনাথের ৫২; কপিল দেবের ৪২ রান এসেছে ঝড়ের বেগে। আশা করা যাক, ওর বলেও এই গতিবেগ অচিরেই এসে যাবে।

কিন্তু অনভিজ্ঞ ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা ঝটপট আউট হতে রাজি হল না। কালীচরণের একশো সাতাশি বাদেও বাকি দশজন তুললেন ৩০৬ রান। অভিজ্ঞ ভারতীয়রা গাভাসকরকে বাদ দিয়ে তুলেছিলেন ২১৯। এই ৪৯৩ রানের বিরাট ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছেন একা কালীচরণ, কিন্তু ভারতীয় বোলারদের মধ্যে অন্তত দুজন দিয়েছেন শতাধিক রান—বেদী এবং চন্দ্রশেখর।

খেলাটা বহু আগেই ঘুমোতে ঘুমোতে মরে এসেছিল। তবু ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে সবাই সোজা হয়ে বসল। 'আর একটি'র আশায়। কিন্তু সানি আর একটি সেঞ্চুরি করলেন না। একই ম্যাচে দুবার সানিকে ফিরিয়ে দিলেন টগবগে ফাস্ট বোলার সিলভেস্টার ক্লার্ক। অবশ্য, আর একটু হলেই 'আর একটি' হত। সানির এবারের স্কোর ৭৩।

চৌহানের মতো ব্যাটসম্যানেরা বোধহয় টেস্ট ক্রিকেটে আসেন ভাল খেলেও সেঞ্চুরি না করার জন্য। এবারও চৌহান আউট হলেন ৮৪ রানের মাথায়। দিলীপ বেঙ্গসরকার টীম থেকে বাদ পড়ার ভয়ে এবং মহীন্দর অমরনাথ বাদ পড়ার কথা জেনে গিয়ে নির্জীব ব্যাটিং করলেন। অধৈর্য দর্শকরা সোডার বোতল ইত্যাদি ছুঁড়ে কিছু ফিল্ডিং প্র্যাকটিস করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় খেলা পাঁচ মিনিট আগেই বন্ধ হয়ে যায়।

বাঙ্গালোরে দ্বিতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইনডিজ স্পিনার জুমাদিনের বদলে আনল ফাস্ট বোলার মার্শালকে। ভারতীয় দলে এলেন মহীন্দরের জায়গায় অংশুমান গায়কোয়াড়। মাইকেল হোল্ডিং, রবার্টস প্রভৃতি নামের বিভিন্ন ধরনের ঝড় ঝাপ্টা এই তরুণ ব্যাটসম্যান সহ্য করেছেন। কিন্তু ঝড় থামলেই ওঁকে ভুলে যাওয়া হয়।

কালীচরণ পরপর দুটি টেস্টেই টসে জিতলেন। কিন্তু এবার নিলেন ব্যাটিং। কালীচরণ ৭১। বাদবাকিরা আগের ম্যাচে করেছিলেন ৩০৬, এবার করলেন ৩৫৬।

কিন্তু অংশুমান বোঝালেন, গাভাসকর শূন্য হাতে ফিরে গেলেও ভারতীয় ইনিংসকে ভদ্র চেহারা দেবার দায়িত্ব নিতে

তিনি সক্ষম, যদি আরো কেউ কেউ পাশে এসে দাঁড়ান। এলেন বেঙ্গসরকার। গায়কোয়াড় এবং বেঙ্গসরকার রান করলেন ৮৭ এবং ৭৩—কিন্তু প্রয়োজনের দিক দিয়ে অনেক সেঞ্চুরিকে অবহেলা করার মতো এই দুটি ইনিংস।

বেঙ্গসরকার আর গায়কোয়ারের অবস্থাও চৌহান আর মহীন্দর অমরনাথের মতো—সত্তর-আশি করার পর কী যেন হয়ে যায়। কেন্টের দ্বিতীয় টীমের এক ব্যাটসম্যান ফ্র্যাঙ্ক উলিকে বলেছিলেন, "আমি প্রায় ম্যাচেই সত্তর-আশি রান করি, কিন্তু একটাও সেঞ্চুরি হল না। ঐ পঁচিশ-ত্রিশ রান কিছুতেই হয় না।" ফ্রাঙ্ক উলি চোখ টিপে বলেছিলেন, "ঐ পঁচিশ-ত্রিশটা রান আগে করে নিলেই হয়।"

বিশ্বনাথ খেললেন ৭০ রানের ভাল ইনিংস, যা বিশ্বনাথের মতো হয়েও পুরোপুরি বিশ্বনাথের মতো দর্শনীয় নয়। কারসন ঘাউড়ি করলেন ৪৩। এবং তারপর, চুয়াত্তর রানের মধ্যে উইলিয়ামস, বাকাস এবং কালীচরণকে ফিরিয়ে দিলেন। তিন উইকেটে চুয়াত্তর থেকে চতুর্থ দিনের শেষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পৌঁছল আট উইকেটে দুশো রানে। ঘাউড়ি একা নিলেন পাঁচ উইকেট, কপিল দেব আর বেদি দুই এবং এক। ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে ভরাডুবি থেকে বাঁচাল ল্যারি গোমেজের অনমনীয় ৮২।

একদিন বাকি, খেলাটির ভাগ্য ঝুলছে সরু সুতোয়—কিন্তু খেলা হল না। রাজনৈতিক কারণে টেস্টম্যাচ পরিত্যক্ত হল। সম্ভবত বিশ্বরেকর্ড। আরো নিশ্চিত হতে গেলে বিখ্যাত ক্রিকেট-স্ট্যাটিসটিয়ান আনন্দজী দোসার কাছে যেতে হবে। হ্যাঁ, তিনি এসবেরও হিসেব রাখেন।

দ্বিতীয় টেস্ট শেষ হবার পর আমরা অনেক কিছুই ভাবছি। ভাবছি, চন্দ্রর জায়গায় নরসীমা রাও কী করবেন? দশ বছরে কলকাতায় কোন টেস্ট ড্র হয়নি, কিন্তু এইবার? এবং আশা করছি, দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু কালী এবং সানি ব্যাটিংয়ে চমক দেখাবেন। অবশ্য, সানি কিছু বেশি রান করলে ভাল হয়। ম্যাচটা জেতা দরকার। বহুদিন পিচে গড়াগড়ি দেওয়া হয়নি।

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

স্টকিস্ট :
মেসার্স সুখলাল মানক লাল পুরান চীনা বাজার কলিকাতা-৭০০০০১

OD/M/78-1

কলকাতার গ্রাঁ প্রি

পুষ্পেন সরকার

শনিবার। ২ ডিসেম্বর। নেতাজি স্টেডিয়ামের ঘড়িতে দুপুর ১-৪৮। গ্রাঁ প্রি টেনিসের সিঙ্গলস সেমি-ফাইনাল। একদিকে নেদারল্যান্ডের স্যান্ডার্স। অন্যদিকে ফ্রান্সের ইয়ানেক নোয়া। বাছাই তালিকায় পাঁচ নম্বর নোয়া। স্যান্ডার্স অ-বাছাই।

খেলার প্রথম দিন থেকেই নোয়া কলকাতার দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছেন। ১৮ বছরের তরুণ।

সিঙ্গলস্ চ্যাম্পিয়ন নোয়া

নোয়া জিতুন সকলেই চান। আগের দুদিনের খেলা দেখে সকলেরই বিশ্বাস জন্মেছে নোয়া ফাইনালে যাবেনই। কিন্তু এ কী? স্যান্ডার্স পর পর তিনটি গেম জিতে গেলেন। নোয়া তো খেলতে পারছেন না!

চতুর্থ গেমে নোয়া নিজের খেলা ফিরে পেলেন। তারপর গড়গড়িয়ে এগিয়ে গেলেন। পর পর পাঁচটি গেম। তারপর ৬—৬ সমান হল। ভ্রূক্ষেপ নেই। টাইব্রেকার। হোক। ৭—৬ গেমে জিতলেন নোয়া প্রথম সেট। দ্বিতীয় সেট। সহজেই ৬—৩। নিশ্চিন্ত হলেন সকলে।

সেমিফাইনালে ওঠার আগে নোয়াকে একটু বেগ দিয়েছিলেন তাঁরই দেশের ফ্রেস। একটি সেট তিনি জিতেছিলেনও। কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় সেটে নোয়া একেবারে কোণঠাসা করে ছেড়েছিলেন ঐ ফ্রেসকে।

ফাইনাল তেমন জমেনি। নোয়া আর পোরটেস। দুজনেই এক দেশের। ৬—৩। ৬—২। ৬৯ মিনিটে নোয়ার জয়।

২৭ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর। সাতদিন। নেতাজি স্টেডিয়ামে গ্রাঁ প্রি টেনিস হল। পৃথিবীর নানা দেশে খেলা হয়। বড় বড় পেশাদার খেলোয়াড়রা এইসব প্রতিযোগিতায় খেলেন। জিতলে অনেক টাকা।

কলকাতায় প্রথম গ্রাঁ প্রি টেনিস জিতেছিলেন বিজয় অমৃতরাজ। এবারও অনেকের আশা ছিল বিজয় জিতবেন। কিন্তু বিজয় কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে গেলেন। আনন্দ হারলেন সেমিফাইনালে। দুজনেই পোরটেসের কাছে।

অন্য খেলোয়াড়দের মধ্যে জাতীয় চ্যাম্পিয়ান রমেশের দিকে নজর ছিল অনেকের। বাবা রামনাথন। বড় খেলোয়াড় ছিলেন। বাবার হাতে গড়া। ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। প্রথম রাউন্ডে লিওনিক এবং দ্বিতীয় রাউন্ডে আমেরিকার জ্যারেটকে হারালেন। দারুণ লড়ে। কোয়ার্টার ফাইনালে স্যান্ডার্সের বিরুদ্ধে প্রথম সেটটায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে হারলেন ৭—৬ গেমে। কিন্তু দ্বিতীয় সেটটায় কিছুই খেলতে পারলেন না।

রমেশের খেলা দেখে আমার ধারণা: বড় হতে হলে তাঁকে আরও আক্রমণাত্মক টেনিস খেলতে হবে। জোরালো সার্ভিস চাই। আজকের টেনিস "পাওয়ার টেনিস"। আক্রমণই রক্ষণ। রক্ষণাত্মক টেনিসের কোন মূল্য নেই। তবে রমেশের খেলার মেজাজটি সুন্দর। অসীম ধৈর্য।

ভারতের খেলোয়াড়দের সাফল্য বলতে ডাবলস ফাইনালে জয়ের অর্ধেক অংশীদার হওয়া। শশী মেনন এবং আমেরিকার স্টুয়ার্ট ডাবলস জিতেছেন।

রমেশ (বাবা-মা'র সঙ্গে)

ডাবল্‌স চ্যাম্পিয়ন স্টুয়ার্ট ও শশী (মাঝখানে)

বড় হয়ে ওঠার খুসীতে এই মেয়েটির মন ভরপুর। আপনার কন্যা ও পুত্র এই মেয়েটির মতোই নিশ্চিত যে তাদের ভবিষ্যতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শিক্ষা, বিবাহ সব-কিছুরই সুব্যবস্থা আপনিই করবেন। সানন্দে এই দায়িত্ব পালন করতে এখন থেকেই আপনি উন্মুখ। তাই না?

আপনার পুত্র-কন্যার ভবিষ্যৎ সুখী ও নিশ্চিত করতে আমাদের যে-কোন সঞ্চয় প্রকল্প থেকে আপনার সঞ্চয়ের আয় অনেক গুণ বাড়িয়ে তুলতে পারেন।

ছোটরা সবাই এসো আমাদের রিচি রোড ও গড়িয়া শাখায় তোমাদের

চিলড্রেন্‌স কাউণ্টার-এ

- নিজের নামে সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলো, পাশবই নাও।
- নিজের নামে টাকা জমা দাও, নিজের সইতে টাকা তোলো।

পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : ৭, রেড ক্রশ প্লেস, কলিকাতা-৭০০ ০০১
হেড অফিস : ১৭, আর এন মুখার্জি রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০১
চেয়ারম্যান : জে এন বিশ্বাস

Progressive/UIB-/78

হাতি শিকারে

অনুরাধা ঘোষ

আমরা যে চা-বাগানে থাকতাম তার চারধারে ছিল নেফার ঘন অরণ্য। চা-বাগানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। দিনের বেলা নানা রঙের পাখি আর প্রজাপতির সমাবেশ হত বাগানে। যেদিকে চোখ যায়, সে দিকেই শুধু চা গাছ আর চা গাছ এক কাপ চায়ের পেছনে এত কাণ্ড! সে অবশ্য অন্য কথা, অন্য কাহিনী।

এত চমৎকার বাগানে হঠাৎ আরম্ভ হল বুনো হাতির উৎপাত। হাতিটা শুধু বুনোই নয়, গুণ্ডাও। রাত হলেই হাতিটা এক কিংবা দলবল নিয়ে ধানখেত নষ্ট করত। মাঝেমধ্যে বাংলোর বাগানের আনারস, ভুট্টাও সাবাড় করত। এত কাছে হাতি, না দেখলে হয়তো বিশ্বাসই করতাম না। হাতির পাল শ্রমিকদেরও বিস্তর ক্ষতি করত। তাদের ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলত প্রায়ই। মাঝে-মধ্যে মেরেও ফেলত দু' একজনকে।

উৎপাত যখন খুব বেড়ে উঠেছে তখন আমাদের এক শিকারী বন্ধু ঠিক করলেন, বুনো হাতিটাকে শেষ করতে হবে। হাতি মারার নির্দেশও পেয়েছিলেন আসাম সরকারের কাছ থেকে। প্রতিটি হাতির পালে একটি করে মাকনা সর্দার থাকে। এই সর্দারটাই যত নষ্টের গোড়া।

শহরের মেয়ে তো, বুনো হাতি দেখার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। চা-বাগানে তাই হাতি দেখে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। ঠিক করলাম, হাতি-শিকারীর সঙ্গী হতেই হবে। শিকারী মিহির চৌধুরী, তাঁর স্ত্রী আর আমরা কর্তা-গিন্নি এক রাতে রওনা হলাম হাতি শিকারে। রাত প্রায় নটা। দুটো জীপ। একটায় সাহায্যকারীর দল, আর একটায় আমরা।

দারুণ উত্তেজনা। মিহিরদার এক হাতে বন্দুক, অত রাত্তিরে জঙ্গলের অন্ধকারে মনে হচ্ছিল হারিয়ে যাব। চারদিকে শুধু জোনাকির আলো। সঙ্গে একটানা ঝিঁঝির ডাক। গাছের ডাল নড়লে বা পাতা ঝরার শব্দে চমকে যাচ্ছিলাম ভীষণভাবে।

হঠাৎ একটা মোটা অশ্বত্থ গাছের আড়ালে কী যেন নড়তে দেখে মিহিরদাকে জীপ থামাতে বললাম ফিসফিস করে। সঙ্কেত পেয়ে অন্য জীপটাও থেমে গেল।

আমি বললাম, "মিহিরদা, মনে হচ্ছে হাতি।" বন্দুক তাক করেই শিকারী দেখলেন, হাতির পায়ে শেকল। অর্থাৎ হাতিটি পোষা। হাতিটি সরকারি চাকুরে। জঙ্গল থেকে কাঠ বয়ে আনে, আর ফরেস্ট অফিসের নানা ধরনের কাজ করে দেয়। বুনো হাতি হঠাৎ পোষা হাতি হয়ে যাওয়ায় সবার কী হাসি!

মিহিরদা আমাকে খুব বকুনি দিয়ে বললেন, "এটাকে মারলে আমার শাস্তি তো হতই, উপরন্তু আমার বন্দুকের লাইসেন্সও বাতিল হয়ে যেত।"

শুনে আমি ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেলাম। সে-রাত্রে আর হাতি শিকার হল না। খানিকক্ষণ জঙ্গলে ঘুরে কর্নার ধারে বসে খেয়েদেয়ে বাড়ি ফিরে এলাম রাত তিনটেয়।

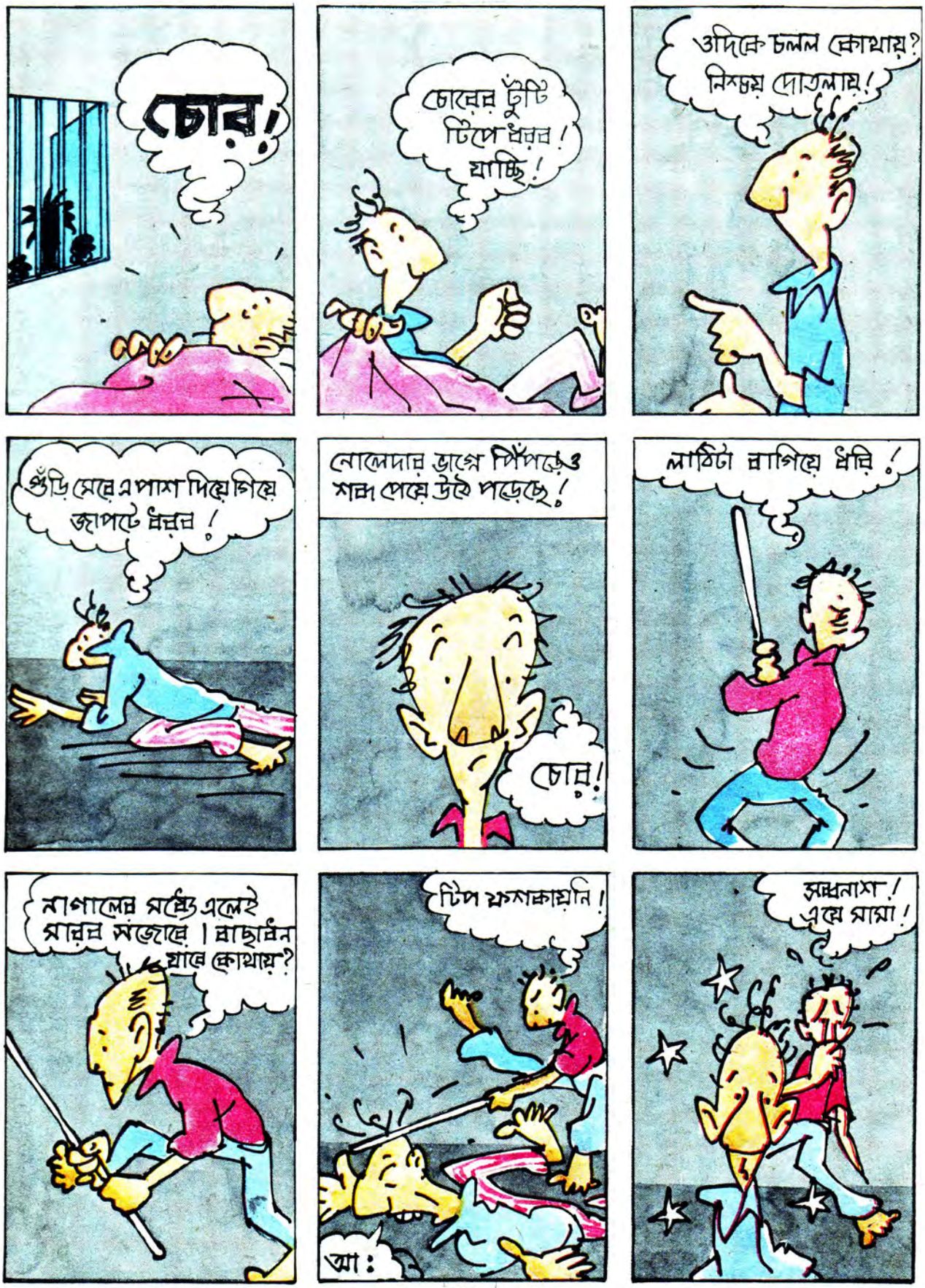
চোর!
চোরের টুঁটি টিপে ধরব! যাচ্ছি!
ওদিকে চলল কোথায়? নিশ্চয় দোতলায়!
পুঁড়ি মেরে এপাশ দিয়ে গিয়ে জাপটে ধরব!
নোলেদার ভাগ্নে পিঁপড়েও শব্দ পেয়ে উঠে পড়েছে!
চোর!
লাঠিটা বাগিয়ে ধরি!
নাগালের মধ্যে এলেই মারব সজোরে। বাছাধন যাবে কোথায়?
টিপ ফসকায়নি!
আ:
সর্বনাশ! এযে মামা!

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

এবার তালগাছের নমুনা দিয়ে শুরু। যতটা চওড়া পাতা হবে সেইমতো টুকরো প্যাস্টেল নিয়ে তাতে সামান্য খাঁজ কেটে চাপ দিয়ে টান দিলেই গাছ ধীরে ধীরে রূপ নেবে। গাছের গুঁড়ি আর পাতা কেমনভাবে করবে তার নমুনা দিলুম আলাদাভাবে। সব সময় মনে রাখবে—যে গাছ আঁকতে যাচ্ছ তার মূল গড়নের দিকে নজর দিলেই দেখবে গাছকে ধরা কত সোজা। তালগাছ করতে পারলেই অনায়াসে তালবন আঁকতে পারবে।

প্যাস্টেলের কাজ

কারিগর

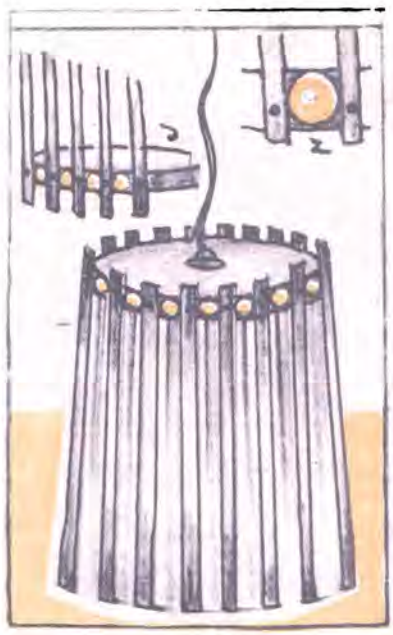

বাঁশের কাজ-
ঝোলানো ল্যাম্প শেড

জোগাড় করা জিনিসের সঙ্গে যোগ করো কিছু পেরেক বোতাম আর কাঠের টুকরো।

শুরু করো—নিজের করা নকশা মাফিক গোল করে কাঠের চাকতি কেটে নিয়ে তার মাঝে তার যাবার মতো একটা ছাঁদা করে রাখো। শেড যতটা লম্বা করতে চাও সেই মতো লম্বা লম্বা বাঁশের চওড়া পাত তৈরি করে গোল চাকতির চারপাশে একে একে (১ নং ছবি) সমান ফাঁক রেখে পেরেক দিয়ে লাগিয়ে শেডের আকার তৈরি করে নাও। কাঠের গায়ে পাত লাগাবার সময় একটা বিষয়ে নজর রাখবে, তা হল—কাঠের চাকতির ওপর দিকে বাঁশের পাতগুলো ইঞ্চিখানেক বার হয়ে থাকবে (নমুনা দেখো)। এবার দুটো পাতের ফাঁকে রঙিন বোতাম লাগিয়ে (২ নং ছবি) বাহার আনো। বাহার ছাড়া এর বিশেষ কাজ হচ্ছে দুটো পাতের মাঝখানে বোতাম থাকার জন্যে পাত দুটো সরে যাবে না। তফাত অনুযায়ী বোতাম কমবে বাড়বে। শেডের কাজ শেষ হলে ভারনিস লাগিয়ে শেষ করে—বড়দের সাহায্য নিয়ে তার আর বালব্ লাগিয়ে- নিজের পড়ার টেবিলে বা বসার ঘরে ঝুলিয়ে দিয়ে দেখো, কী সুন্দর লাগে।

জেনে রাখো (১) চাকতির কাঠ যেন খুব পাতলা আর ভারী না হয়। (২) বাঁশের পাতও খুব পাতলা না হয়। (৩) পেরেক ঠোকার সময় আস্তে-আস্তে ঘা দেবে। তা নাহলে পাতি আর কাঠ দুটোই ভেঙে যেতে পারে। (৪) চাকতির মাঝ দিয়ে তার গলিয়ে ওপর দিকে একটা গিঁট দেবে। (৫) বাঁশের পাতগুলো শিরিস কাগজ দিয়ে ঘষে-মেজে পরিষ্কার করবে। (৬) পাত পেরেক দিয়ে লাগাবার সময় ফেভিকল দিয়ে নেবে।

যখন খুশি মুখে দিন মজার মিষ্টি নিউট্রিন

নিউট্রিন-এর
সুইট ও টফি

হ্যাঁ, এই তো সেই খাসা মিল্টি, যা বছরের পর বছর ধরে
ভারতের অন্যান্য সব শহরে বাচ্চাদের মন কেড়ে নিয়েছে।
এবার সেই মিল্টি এই শহরেও হাজির...
বাচ্চাদের মুখে সারাদিন 'চাকুম-চুকুম' চলতেই থাকবে।
আজই কিছু নিউট্রিন মুখে দিন, এরপর তফাৎটা শুধু বুঝুন।

nutrine

চাকুম-চুকুম খাসা
মিষ্টি দিয়ে ঠাসা

নিউট্রিন কনফেকশনারী কোম্পানি লিমিটেড
প্যালামানের রোড
চিত্তুর ৫৭১ ০০২, অন্ধ্র প্রদেশ

CAS/NC-20/78 BEN

ANANDAMELA Regd. No. WB|CC 264

ক্যাপ্টেন গাভাসকরের

ফোটো পংকজ শা